বাংলা

স্নাতকোত্তর (সিবিসিএস) কার্যক্রম

এম.এ.

চতুর্থ সেমেস্টার

পত্র—ডিএসই/DSE-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পাঠ-সহায়ক উপাদান

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ
ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন অ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া-৭৪১২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

Post Graduate Board of Studies (PGBOS) Members of Department of Bengali, Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Sl. No.	Name & Designation	Role
1	**Prof. (Dr.) Sanjit Mondal,** Professor & Head, Department of Bengali, University of Kalyani.	Chairperson
2	**Prof. (Dr.) Sabitri Nanda Chakraborty** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
3	**Prof. (Dr.) Sukhen Biswas,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
4	**Prof. (Dr.) Prabir Pramanick,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
5	**Prof. (Dr.) Nandini Bandyopadhyay,** Professor, Department of Bengali, University of Kalyani.	Member
6	**Prof. (Dr.) Adityakumar Lala,** Professor, Department of Bengali, Gourbanga University	External Nominated Member
7	**Prof. (Dr.) Narugopal Dey,** Professor, Department of Bengali, Sidho Kanho Birsha University	External Nominated Member
8	**Dr. Rajsekhar Nandi,** Assistant Professor of Bengali, DODL, University of Kalyani.	Member
9	**Prof. (Dr.) Tapati Chakrabarty,** Director, DODL, University of Kalyani	Convener

পাঠ প্রণেতা

অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস — অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত — সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

এপ্রিল, ২০২৪

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও ইস্ট ইন্ডিয়া ফটো কম্পোজিং সেন্টার, ২০৯এ, বিধান সরণী, কলকাতা-৭০০ ০০৬ দ্বারা মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইন অনুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের জন্য লেখক বা পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Message

Satisfying the varied needs of distance learners, overcoming the obstacle of Distance and reaching the unreached students are the three fold functions catered by Open and Distance Learning (ODL) systems. The onus lies on writers, editors, production professionals and other personnel involved in the process to overcome the challenges inherent to curriculum design and production of relevant Self-Learning Materials (SLMs). At the University of Kalyani a dedicated team under the able guidance of the Hon'ble Vice-Chancellor has invested its best efforts, professionally and in keeping with the demands of Post Graduate CBCS Programmes in Distance Mode to devise a self-sufficient curriculum for each course offered by the Directorate of Open and Distance Learning (DODL), University of Kalyani.

Development of printed SLMs for students admitted to the DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2020 had been our endeavor. We are happy to have achieved our goal.

Utmost care and precision have been ensured in the development of the SLMs, making them useful to the learners, besides avoiding errors as far as practicable. Further suggestions from the stakeholders in this would be welcome.

During the production-process of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from **Professor (Dr.) Amalendu Bhunia, Hon'ble Vice-Chancellor, University of Kalyani**, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it with in proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Sincere gratitude is due to the respective chairpersons as well as each and every member of the PG-BoS (DODL), University of Kalyani. Heartfelt thanks are also due to the Course Writers-faculty members at the DODL, subject-experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have enriched the SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would especially like to convey gratitude to all other University dignitaries and personnel involved either at the conceptual or operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their persistent and coordinated efforts have resulted in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self-Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyrights reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self-Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open and Distance Learning
University of Kalyani

পাঠক্রম

পত্র—ডিএসই/DSE-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন ও প্রয়োগ

পর্যায় গ্রন্থ ১ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক ১ : শৈলীবিজ্ঞান

একক ২ : অভিধানবিজ্ঞান

একক ৩ : সমাজভাষাবিজ্ঞান

একক ৪ : মনোভাষাবিজ্ঞান

পর্যায় গ্রন্থ ২ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক ১ : নৈঃশব্দের ভাষা

একক ২ : সমালোচনার ভাষা

একক ৩ : পদ্য ভাষা

একক ৪ : গদ্য ভাষা

একক ৫ : মেয়েলি ভাষা

একক ৬ : ক্যাম্পাসের ভাষা

পর্যায় গ্রন্থ ৩ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক ১ : সম্ভাষণের ভাষা

একক ২ : লুপ্ত ভাষা

একক ৩ : খবরের ভাষা

একক ৪ : ভয়ের ভাষা

একক ৫ : উদাহরণের ভাষা

একক ৬ : বাংলা প্রশ্নপত্রের ভাষা

পর্যায় গ্রন্থ ৪ (সময় ৪ ঘণ্টা)

একক ১ : দ্বিতীয় ভাষা

একক ২ : পরকীয়া ভাষা

একক ৩ : ব্ল্যাকমেলের ভাষা

একক ৪ : বাংরেজি ভাষা

একক ৫ : স্তাবকতার ভাষা

একক ৬ : মিথ্যা ভাষা

পত্র—ডিএসই/DSE-৪০৫
বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব
ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন ও প্রয়োগ

সূচিপত্র

পত্র—ডিএসই/ DSE-৪০৫	একক	শিরোনাম	পাঠ প্রণেতা	পৃষ্ঠা
পর্যায় গ্রন্থ ১	১.	শৈলীবিজ্ঞান	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	১-১৫
	২.	অভিধানবিজ্ঞান		১৬-২২
	৩.	সমাজভাষাবিজ্ঞান		২৩-৩৪
	৪.	মনোভাষাবিজ্ঞান		৩৫-৪০
পর্যায় গ্রন্থ ২	১.	নৈঃশব্দের ভাষা	ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	৪১-৪৪
	২.	সমালোচনার ভাষা		৪৫-৪৮
	৩.	পদ্য ভাষা		৪৯-৫২
	৪.	গদ্য ভাষা		৫৩-৫৭
	৫.	মেয়েলি ভাষা		৫৮-৬১
	৬.	ক্যাম্পাসের ভাষা		৬২-৬৪
পর্যায় গ্রন্থ ৩	১.	সম্ভাষণের ভাষা	অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস	৬৫-৬৮
	২.	লুপ্ত ভাষা		৬৯-৭৩
	৩.	খবরের ভাষা		৭৪-৭৯
	৪.	ভয়ের ভাষা		৮০-৮৪
	৫.	উদাহরণের ভাষা		৮৫-৮৮
	৬.	বাংলা প্রশ্নপত্রের ভাষা		৮৯-৯২
পর্যায় গ্রন্থ ৪	১.	দ্বিতীয় ভাষা	ড. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত	৯৩-৯৬
	২.	পরকীয়া ভাষা		৯৭-৯৯
	৩.	ব্ল্যাকমেলের ভাষা		১০০-১০৪
	৪.	বাংরেজি ভাষা		১০৫-১০৭
	৫.	স্তাবকতার ভাষা		১০৮-১১২
	৬.	মিথ্যা ভাষা		১১৩-১১৬

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন ও প্রয়োগ

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক-১

শৈলীবিজ্ঞান

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.১.১.১ : প্রস্তাবনা

৪০৫.১.১.২ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনায় শৈলী

৪০৫.১.১.৩ : শৈলী থেকে শৈলীবিজ্ঞান

৪০৫.১.১.৪ : শৈলীবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ

৪০৫.১.১.৫ : শৈলীবিজ্ঞানের প্রণালীতত্ত্ব

ক. ধ্বনি :

খ. শব্দ :

গ. বাক্য :

৪০৫.১.১.৬ : সাধারণ শৈলীবিজ্ঞানে শৈলী

ক. ছোটগল্প :

খ. উপন্যাস :

৪০৫.১.১.৭ : শৈলীবিজ্ঞানে শৈলীর বহুরূপতা

৪০৫.১.১.৮ : শৈলীবিজ্ঞান : ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলী

৪০৫.১.১.৯ : উপসংহার

৪০৫.১.১.১০ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.১.১.১১ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.১.১.১ : প্রস্তাবনা

"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও।"

রবীন্দ্রনাথের লেখা 'শেষের কবিতা'র লাইন। উপন্যাসটি পড়লে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সহেগ 'অমিত লাবণ্য'র প্রেমজ দর্শন ও পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। তারই সঙ্গে আরও বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ভাবনায় 'শৈলী'র প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ শৈলীগুণে অনায়াসে এখানে 'সময় চেতনা'কে উন্নীত করেছেন 'দার্শনিক চেতনা'য়।

বাংলায় 'শৈলী' শব্দটা শুনলেই মনে পড়ে ইংরেজি 'Style' শব্দটি। ল্যাটিন ভাষায় একটি শব্দ 'স্টিলোস'। এই 'স্টিলোস'-এর অর্থ হল, মোমের চৌকো টুকরোর উপর লেখার জন্য ছুঁচলো কলম। পরবর্তীকালে এই 'স্টিলোস' থেকেই 'স্টাইল' শব্দের ব্যবহার শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, ইংরেজি 'Style' কথাটির অর্থ কিন্তু একাধিক। কারও মতে 'Style' মানে 'রীতি'। কেউ বা বলেন 'শৈলী'। তবে বর্তমানের বিভিন্ন সাহিত্যালোচনায়, এমনকী সংবাদপত্রেও 'রীতি'-র চেয়ে 'শৈলী'র আবেদন বেশি। কারণ 'শৈলী' শব্দের পৌনঃপুনিকতা (frequency) রীতির চেয়ে অনেক বেশি।

'Style' সম্পর্কে ফরাসি দার্শনিক বুফোঁর বিখ্যাত উক্তি এখানে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন—

'Le Style c'est I'homme me'me.
(Style is the man himself)

অর্থাৎ 'শৈলী' হল লেখকের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। দার্শনিক প্রুস্ত-এর প্রতিধ্বনি করে অনেকেই বলেছেন—শিল্পীর কাছে রঙের যে ভূমিকা, কবি-সাহিত্যিকদের কাছে 'শৈলী'র সেই একই ভূমিকা। 'শৈলী' হল—লেখকের দ্বারা সজ্ঞানে নির্বাচিত বা অচেতনভাবে নিয়োজিত সেই সব ভাষাগত উপায়, যার দ্বারা তিনি পাঠকের সঙ্গে অভিপ্রেত যোগাযোগ সাধন করেন। অর্থাৎ লেখকের বা বক্তার মনন, চিন্তন, অনুভবের যে নিজস্ব রীতি তার প্রকাশই হল 'শৈলী'।

৪০৫.১.১.২ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনায় শৈলী

ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে যা 'রীতি', ইউরোপীয় কাব্যতত্ত্বে তাকেই বলা হয়েছে 'স্টাইল'। এটা অবশ্যই দেশকাল নিরপেক্ষ ধারণা। আমরা যদি একটু পিছনে তাকাই, তবে 'শৈলী' সম্পর্কে ধারণা আরও একটু গাঢ় হতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বামন বলেছিলেন, 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য, বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ বিশেষো গুণাত্মা'। রীতি বা শৈলীকেই বামন কাব্যের আত্মা বলে অভিহিত করেছেন। বামনের মতে, বিশিষ্ট পদরচনাই রীতি। এ ক্ষেত্রে তিনি তিনটি রীতির কথা বলেছেন। যথা—বৈদর্ভী, গৌড়ী ও পাঞ্চালী। পরবর্তীকালে 'সাহিত্যদর্পণ'-কার বিশ্বনাথ বলেছেন, 'রীতয়ঃ অবয়ব-সংস্থান বিশেষবৎ' অর্থাৎ তিনি রীতিকে দেখেছেন কাব্যের বিশিষ্ট অবয়ব সংস্থানের বিষয় হিসেবে। প্রাচীন ভারতীয় আলংকারিকদের রীতি বিষয়ক ধারণা থেকে একটা সিদ্ধান্ত আসা যায়। সেটা হল, মানবদেহের 'আত্মা'কে বিশ্লেষণ করা যায় না। উপলব্ধি করতে হয়। ঠিক সেইরকমভাবেই রীতি অবিশ্লেষ্য। রীতি উপলব্ধির।

প্রাচীন ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের মতো, ইউরোপীয় কাব্যতত্ত্বেও 'শৈলী' সম্পর্কিত অনেক ধারণা আছে। গ্রীক সাহিত্য স্টাইল সম্পর্কে দুধরনের মতবাদ প্রচলিত। প্রথম মতবাদের প্রবক্তা প্লেটো। তিনি 'স্টাইল'কে ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। তাঁর মতে, স্টাইল হল সাহিত্যের একটি মৌলিক গুণ। এবং এই স্টাইলের ওপরই সাহিত্যের মূল নির্ভর করে। এই গুণ যেহেতু ভেতরের, তাই একে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। অপরপকষে দ্বিতীয় মতবাদের প্রবক্তা অ্যারিস্টটল। তাঁর মতে, স্টাইল হল রচনার অনেকগুলি উপাদানের ফল। অ্যারিস্টটল সম্প্রদায়ের মতে শৈলী হল কোনো রচনার বাহ্যিক বস্তুগত উপাদান ও গুণ। তিনি তাঁর শৈলী বিষয়ক তত্ত্বের সাহায্যে হোমারীয় স্টাইল, মধ্যযুগীয় স্টাইল, ফরাসি স্টাইল ইত্যাদির প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন। প্রাচীনকালের মতো আধুনিক ইউরোপেও স্টাইল সম্পর্কে অনেক মতবাদ প্রচলিত। শোপেনহাওয়ার স্টাইলকে বলেছেন, 'Physiogromy of the mind'। নিউম্যান বলেছেন 'Style is a thinking out into language। আবার ওয়ালটার পেটারের মতে স্টাইল হল '.....the finner accommodationof speech to that vision within'। এরই মধ্যে সব মনীষীর মতবাদকে ছাপিয়ে গেছে দার্শনিক বুফোঁর মতবাদ। তাই 'Style is the man himself' বর্তমানে প্রবচনে রূপান্তরিত। তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মনীষীদের 'শৈলী' সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা থেকে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। লেখকের বা বক্তার মনন, চিন্তন অনুভবের যে নিজস্ব রীতি তা উপযুক্ত ভাষায় প্রকাশই হল 'শৈলী'। সাহিত্য রচনায় যদি শৈলী বা স্টাইল-এর কোনো অস্তিত্ব থাকে তবেতা ভাষাকে কেন্দ্র করেই বিকশিত। বামনের 'বিশিষ্ট পদরচনা' (way of writing) থেকে শুরু করে একালের বিশ্বনাথের 'অবয়ব সংস্থান' (a good way of expressing oneself) সলে প্রকারান্তরে সাহিত্যের ভাষাকেই ইঙ্গিত করছে।

৪০৫.১.১.৩ : শৈলী থেকে শৈলীবিজ্ঞান

আকর্ষণীয় শৈলীর প্রাণবিন্দুই হল প্রাঞ্জলতা। সাধারণত কবিতায় বা গদ্যে লেখকের প্রথম লিখে ফেলার ঘটনাটা ঘটে। সেক্ষেত্রে লেকক যে সবসময় খুব ভেবেচিন্তে রীতির বিভিন্ন উপাদানগুলি নির্বাচন করেন তা নয়। অনেকসময় নির্বাচন ব্যাপারটা আসে পরবর্তী ভাবনায়। 'After thought' হিসেবে। দেখা গেল, কিটস কবিতা লিখতে গিয়ে 'blue'-এর চে? 'আরও নীল' কোনো শব্দের খোঁজ করছেন। অথবা রবীন্দ্রনাথ 'গগনে' শব্দ কেটে দিয়ে 'অম্বরে' বসাচ্ছেন। কিটসের 'আরও নীল' অথবা রবীন্দ্রনাথের 'অম্বরে' নির্বাচন প্রক্রিয়াটাই হল সচেতন। যাকে অন্যভাবে বলা যেতে পারে 'After thought'... লেখক ঠিক কোন্ শব্দটি বসাবেন, কোন্ ধরনের বাগ্‌ভঙ্গি ব্যবহার করবেন, কীভাবে অনুচ্ছেদ সাজাবেন, কীভাবে রচনার পরম্পরা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেগুলি নানা উপলক্ষ্য বা context-এর উপর নির্ভরশীল। এই যে রচনাগত ভিন্নতা বা শৈলী—সেই সম্পর্কে বিধিবদ্ধ আলোচনাকে বলা হয় 'শৈলীবিজ্ঞান' বা 'stylistics'।

সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত অনেকেই 'শৈলীবিজ্ঞান'-কে নানাদিকে থেকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। জিওফ্রে এন. লিচ তাঁর 'A Linguistic Guide to Brglish Poetry' গ্রন্থে শৈলীবিজ্ঞানকে বলেছেন যে, সাহিত্যের শৈলী বিষয়ক আলোচনা। বিশেষভাবে সাহিত্যের ভাষাবিষয়ক ব্যবহারের অনুশীলন। 'Theory of Literature' গ্রন্থে রেনে ওয়েলাস বলেছেন যে, স্টাইলিসটিকস হচ্ছে সাহিত্যের ভাষার আলোচনা। এ ছাড়া অনেক সমালোচকই স্বীকার করেছেনষ শৈলীবিজ্ঞানের লক্ষ্য সাহিত্যের ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক অনুশীলন। এই প্রসঙ্গে G.W. Turner-এর বক্তব্যটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি 'Stylistics' (1973) গ্রন্থে লিখেছেন—

".....Stylistics is that part of Linguistics which concentrates on variation in the use of Language, often, but not exclusively, with special attention to the most conscious and complex uses of Language in Literature.....Stylistics means the study of style, with a suggestion, from the form of the word, of a scientific or at least methodical study." Page-(7-8)

বিভিন্ন সমালোচক কর্তৃক 'শৈলীবিজ্ঞান'কে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা থেকেই 'শৈলীবিজ্ঞান'-এর একটা সাধারণ ধর্ম আমরা অনুভব করতে পারি। সেটা হল, শৈলীবিজ্ঞান মূলত সাহিত্যের ভাষাতাত্ত্বিক অনুশীলন এবং তার ভিতর দিয়েই সাহিত্যের শৈলী প্রকৃতি নির্ণয় করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে স্মরণে থাকা উচিত, 'শৈলীবিজ্ঞান' নিছক ভাষা বিশ্লেষণের ব্যাপার নয়। তারও একটা নন্দনতাত্ত্বিক দিক আছে।

সেই প্রাচীনকাল থেকে 'শৈলী' সম্পর্কে ভারতবর্ষ ও ইউরোপে নানা ধরনের চিন্তাচেতনার পরিচয় মিললেও 'শৈলীবিজ্ঞান'-এর ধারণা একান্তভাবেই ইউরোপের। শৈলীর বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই শৈলীবিজ্ঞানের জন্ম। মূলত ভাষাবিজ্ঞানের সূত্র অবলম্বন করে সাহিত্যের শৈলীকে নতুন পথে যাচাই করার প্রবণতা দেখা দিতেই জন্ম হল শৈলী থেকে শৈলীবিজ্ঞানের। স্টাইল থেকে স্টাইলস্টিক্সের। শৈলীবিজ্ঞানে ভাষাচর্চার পথ ধরে শৈলীর চর্চা করা হয়। এর মূল কথাই হল সাহিত্যকর্মের ভাষাবৈচিত্র্য খুঁজে বার করা। এটি শব্দের সজ্জা বা ভাষাবৈজ্ঞানিক গঠনকে স্পষ্ট করে। Linguistic stylistics সেই শৈলীবিজ্ঞান যা ভাষাবৈজ্ঞানিক ধারণার সাহায্যে উদ্দীপকের আবিষ্কার ও বর্ণনের কাজ করে।

G.W. Turner তাঁর 'Stylistics' (1973) গ্রন্থে লিখেছেন সাহিত্য ভাষার মাধ্যমে যে শিল্পসৌন্দর্য লাভ করে, সেই সৌন্দর্য-বিচারকেও বুঝতে সাহায্য করে শৈলীবিজ্ঞান। "The study of style, stylistics, must like other branches of linguistics, generalize." P-13

৪০৫.১.১.৪ : শৈলীবিজ্ঞানের শ্রেণীবিভাগ

বিংশ শতকে ইউরোপে ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনা শুরু হয়েছিল। কারণ সকল সমালোচক ছিলেন ভাষাবিজ্ঞানী। এরপর সাহিত্যেকেন্দ্রিক আধুনিক শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ফরাসি সমালোচকরা। ইংরেজ ও মার্কিন সমালোচকদের তুলনায় ফরাসিদের আলোচনার গভীরতা ছিল বেশি। সেসময় শৈলীবিজ্ঞানের সাহিত্যকেন্দ্রিক বিষয়গুলি ছিল : বাক্প্রতিমা (imagery); রূপক (allegory); প্রতীক (symbol); প্রত্নপ্রতিমা (archetype) ইত্যাদি। আর চমস্কির 'সংবর্তনী সঞ্জননী ব্যাকরণতত্ত্ব' আবিষ্কারের পর ভাষাগত দিক দিয়ে শৈলীবিজ্ঞান বিশেষভাবে প্রভাবিত হল। মূলত দুটি বিষয় এখানে প্রাধান্য পেল—(ক) সংবর্তনী-সঞ্জননী ব্যাকরণতত্ত্ব (খ) বাক্য ও শব্দের অর্থ। সাহিত্যালোচনা ও ভাষাবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে শৈলীবিজ্ঞানের তিনটি শাখা বিন্যস্ত করা যেতে পারে।

(১) শৈলীভাষাবিজ্ঞান : এখানে শৈলীবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের শাখা।

(২) সাহিত্যশৈলীবিজ্ঞান : এটি সাহিত্যালোচনার উপশাখা।

(৩) সাধারণ শৈলীবিজ্ঞান : এটি প্রথম ও দ্বিতীয় শাখার মিলিত রূপ।

এখানে প্রয়োজনে ভাষাবিজ্ঞান ও প্রচলিত সমালোচনার সাহায্য নেওয়া হয়। সাধারণ শৈলীবিজ্ঞানে যেহেতু ভাষাবিজ্ঞান ও প্রচলিত সাহিত্যালোচনা সবই থাকে তাই এই শাখা নিয়েই এখানে আলোচনা করা হবে।

৪০৫.১.১.৫ : শৈলীবিজ্ঞানের প্রণালীতত্ত্ব

Linguistic Stylistics সেই শৈলীবিজ্ঞান যা ভাষাবৈজ্ঞানিক ধারণার সাহায্যে উদ্দীপকের আবিষ্কার ও বর্ণনের কাজ করে। ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদির মধ্যেই স্টাইলের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। কারণ স্টাইলিস্টিকস কোনো আইডিয়া নয়, কোনো ভাববস্তুও নয়। এই প্রসঙ্গে স্টিফেন উপম্যান তাঁর 'Style in the French Novel' (1957) গ্রন্থে লিখেছেন—

"It is concerned with Linguistic values, not with historical development. Naturally, any stage in the evolution of a Language can become the subject of stylistic enquiry, but the approach will always be descriptive."

কেউবা নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রমের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এই আলোচনা থেকে শৈলীবিজ্ঞানের একটা প্রণালীতত্ত্ব নির্ণয় করা যেতে পারে। সেটা এই রকম—

বাক্য নির্মিত (Sentence structure) : এখানে আলোচনা করা এই বিষয়গুলো—

১. বাক্যের দৈর্ঘ্য : হ্রস্ব, দীর্ঘ; ২. সরল, জটিল ও যৌগিক; ৩. বাক্যাংশ; ৪. অনুচ্ছেদ; ৫. শব্দক্রম।

শব্দনির্মিত *(verbal structure) :* ১. শব্দরূপ-তৎসম, তদ্ভব ও দেশিবিদেশি; ২. ধ্বনি ও অক্ষর; ৩. বিশেষণ; ৪. দ্ব্যর্থকতা; ৫. একক যৌগিক।

বাক্যবিন্যাস *(Syntax) :* ১. বিরাম চিহ্ন; ২. উদ্দেশ্য-বিধেয় সংযোজক; ৩. শব্দক্রম; ৪. বাক্যাংশের অনুক্রম →

ব্যাকরণ *(Grammar) :* ১. পদরূপ—বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, সর্বনাম ইত্যাদি; ২. ধ্বনিতত্ত্ব; ৩. শব্দার্থতত্ত্ব →

বিচ্যুতি *(Deviations) :* ১. শব্দার্থগত; ২. শব্দগত; ৩. ব্যাকরণগত; ৪. ধ্বনিগত; ৫. আঞ্চলিক

অলংকারতত্ত্ব *(Rhetoric) :* ১. উপমা; ২. চিত্রকল্প; ৩. অলংকার ইত্যাদি

পরিসংখ্যান *(Statistics) :* ১. বাক্য ও শব্দ ব্যবহারের সংখ্যা; ২. অনুপাত; ৩. শতকরা হার

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টা বোঝানো যেতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছিন্নপত্রাবলী'তে ১৫২ সংখ্যক পত্রে লিখেছেন—

"কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলিপরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম-নদী-প্রান্তর-পর্বত-নগর-বনের উপর দিয়ে যুগ যুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে ক্লান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে"।

অনুভূতিতে এই ভাষায় ঐশ্বর্য সুদূরপ্রসারী। প্রতিটি শব্দ বেদনাময় সঙ্গীতের সুরে গঠিত। নীল, আকাশ, ধূসর, সঙ্গীহীন, ম্লান নেত্র, মৌন মুখ, সোনার চেলি ইত্যাদি শব্দ সুরসঙ্গতিতে সমৃদ্ধ। শব্দসজ্জায় বিশেষণ নির্বাচনেও শিল্পী সার্থক। 'কোমল গান্ধার'-রে বিষাদময় ব্যঞ্জনার নিবিড়তা সৃষ্টিতে—একাকিনী, ম্লান নেত্রে, মৌন মুখে, অসীম সন্ধ্যা শব্দগুলোর ব্যবহার অসাধারণ। তাছাড়াও একটি কমা, কেটি সেমিকোলন আর একটি পূর্ণচ্ছেদও সঙ্গীতের মীড়, গমক ও মূর্ছনা সৃষ্টি করেছে। শৈলীবিজ্ঞানের প্রণালীতত্ত্বে এই ভাষা বিচার করলে দেখা যাবে, রবীন্দ্রনাথ ভাষার মাধ্যমে এখানে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন। চোখের জল আর গানের সুরে বেদনাঋদ্ধ আনন্দ দিয়েছে পাঠককে।

এখানে আমরা শৈলীবিজ্ঞানের বিস্তারিত প্রণালীতত্ত্ব আলোচনা না করে মূলত সংক্ষিপ্ত রূপে ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যের শৈলী খুঁজব।

সাধারণ শৈলীবিজ্ঞানে গদ্য ও পদ্য দু-জাতীয় রচনারই বিশ্লেষণ করা হয়। একে বলা হয় শৈলীবিজ্ঞানের প্রণালীতত্ত্ব। গ্রাহাম হগ, স্টিফেন উপম্যান, রেনে ওয়েলস, চমস্কি প্রমুখ সমলোচক শৈলীবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রণালীতত্ত্বের কথা বলেছেন। কেউ শব্দার্থতত্ত্ব, কেউ বিচ্যুতি, কেউ অলঙ্কারতত্ত্ব, কেউ পরিসংখ্যান, কেউ বাক্যগঠন, কেউ শব্দগঠন, কেউ বা নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রমের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। শৈলীবিজ্ঞানে কোনো লেখক বা যুগের শৈলী খুঁজতে হলে সেই লেখক বা সেই যুগের নিজস্ব রচনালক্ষণ বিশ্লেষণ করতে হয়। সেগুলি—ধ্বনিবিন্যাস, শব্দসংস্থান, বাক্যযোজনা, রচনার আরম্ভ, শেষ ইত্যাদি। আমরা জানি, ভাষায় বিভিন্ন উপকরণ আছে। সেগুলি—ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি। তাদের বিন্যাস ও প্রক্রিয়া বিধিবদ্ধভাবে চালিত করার জন্য প্রচলিত ব্যাকরণে কিছু নিয়মনীতি আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবণতা, বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিস্থিতি ও সাহিত্যিক প্রেরণার জন্য ভাষা ব্যবহারকারী সবসময় সেই প্রচলিত গতানুগতিক নিয়মনীতি মেনে চলে না। প্রচলিত নিয়মনীতি থেকে এই যে সরে আসা (deviation) ঘটা অনেক সময় বিশেষ ভাবপ্রকাশে প্রতিবন্ধক না হয়ে বরং অপরিহার্য হয়। বক্তার সামগ্রিক প্রকাশভঙ্গি ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা ব্যাকরণের এই নিয়ম লঙ্ঘনকে আর অশুদ্ধ বলতে পারি না। একেই বলা হয় ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য (variation in the use of Language)। এর দ্বারাই লেখক বা যুগের শৈলী ধরা পড়ে। নীচে পর্যায়ক্রমে ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদির আলোচনা করা হল—

ক. ধ্বনি : শৈলীবিজ্ঞানে সেই প্রাচীনকাল থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অলঙ্কারশাস্ত্রে ধ্বনির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কোনো শব্দের ধ্বনিগত, রূপগত এবং অর্থগত দিকগুলি শৈলীবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। ধ্বনিগত আলোচনায়, আধুনিক কালে দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়।

(১) ধ্বনির অনুকারক শব্দ (Primary oromatopocia)

(২) ধ্বনির অনুকারক নয় এমন শব্দ (Secondary oromatopocia)

এই দুই ধরনের ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাংলা ভাষাতে অনেক আছে। রবীন্দ্রনাথ 'শব্দতত্ত্ব প্রবন্ধাবলী'তে 'ধ্বন্যাত্মক শব্দ' প্রবন্ধে দুই ধরনের শব্দেরই বিশ্লেষণ হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যে এর যথেষ্ট উদাহরণ আছে।—

প্রথমে ধ্বনির অনুকারক শব্দের আলোচনা—

(ক) বৃষ্টি পড়ে **টাপুরটাপুর** (ছেলেভুলানো ছড়া)

(খ) **শনশন** বনবীথিকা (বর্ষামঙ্গল)

(গ) পাতায় পাতায় **টুপুরটুপুর** (গীতবিতান)

এবারে ধ্বনির অনুকারক নয় কিন্তু ভাবের প্রকাশক এমন শব্দের আলোচনা—

(ক) **টনটন** করে বুকের ভিতরটা। (শেষ সপ্তক)

(খ) চারিদিকে তীক্ষ্ণ আলো **ঝকমক** করে। (নবজাতক)

(গ) ছোটো ছেলেরা জড়ো হয়েছে ঘরের কোণে **মিটমিটে** আলোয়। (শেষ সপ্তক)

উল্লেখ্য, প্রথম শ্রেণির ধ্বনিগুলোর আবেদন পাঠকের শ্রুতির কাছে। এই শ্রেণি পাঠকের মনে 'গতিশীল বাক্‌প্রতিমা' (Kinesthetic imagery) সৃষ্টি করেছে। আবার দ্বিতীয়টির আবেদন পাঠকের মনোলোকে। পাঠকের মনে দ্বিতীয়টি 'স্থিতিশীল বাগ্‌প্রতিমা' (Static Imagery) সৃষ্টি করেছে। সাহিত্যে সাধারণত এই ধরনের ধ্বনিগুলো মূলত সংকেতের কাজ করে। লেখক বা বিষয়ভেদে এই সংকেতের অর্থ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করাই হল ধ্বনির শৈলীচর্চা।

খ. শব্দ : ভারতীয় সনাতন ভাবনায় শব্দমাত্রই ব্রহ্ম। কারণ শব্দমাত্রই ব্রহ্মের মতো নির্গুণ। লেখকদের কলমে শব্দ সাধারণত ব্যাকরণের আক্রোশ আর অভিধান নির্দিষ্ট অর্থের অনুশাসন অস্বীকার করে। এর ফলে শব্দগুলো নতুন নতুন ইশারা, নতুন কৌশল, নতুন ভঙ্গি নিয়ে সাহিত্যের রাজ্যে নিত্যনতুন দ্যোতনায় উপস্থিত হয়। সাধারণত ওই শব্দসকল রচনার মধ্যে দুই ধরনের শৈলী গড়ে তোলে—

(১) স্বাভাবিক বাগ্‌ধারা থেকে দূরে সরে গিয়ে অপ্রচলিত, রূপকায়িত, প্রসারিত শব্দের মাধ্যমে গড়ে ওঠে অস্বাভাবিক শৈলী।

(২) প্রচলিত ও যথার্থ শব্দের দ্বারা গঠিত হয় স্বচ্ছতম শৈলী।

প্রসঙ্গাধীন অর্থই বেশি গুরুত্ব পায়। ব্যাকরণের নিয়মকানুন সেখানে তুচ্ছ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেভুলানো ছড়া'র উদাহরণ দিয়ে বলা যায়—

"এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাগা টুক্‌টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।।"

অথবা

"খোকা যাবেন নায়ে।
লাল **জুতুয়া** পায়ে।।"

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে উপরের ছড়া দুটি অংশবিশেষ ব্যাকরণের নিয়মে অশুদ্ধ। প্রথমটিতে পুংলিঙ্গবাচক 'ভাই' শব্দটির আগে স্ত্রীলিঙ্গবাচক বিশেষণ 'গুণবতী' ব্যবহার করা হয়েছে। আবার 'জুতুয়া' শব্দের গঠন ব্যাকরণের প্রচলিত নিয়মে ব্যাখ্যা করা যায় না। 'জুতা'-র সঙ্গে 'উয়া' প্রত্যয় ব্যাকরণের নিয়মে অসঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু 'ভাই' ও 'শিশু'-র প্রতি দিদি ও অন্যের যে স্নেহমমতার ভাব বা 'গুণবতী' ও 'জুতুয়া'-এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই যে ব্যাকরণের নিয়মের ব্যতিক্রম একে আর অশুদ্ধ বলতে পারি না। বরঞ্চ ওই বিশেষ ভাবটি প্রকাশের পক্ষে ওই প্রত্যয়টি অপরিহার্য। এই "অপরিহার্য ব্যতিক্রম" হল শৈলীর মূল পরিচয়। সুতরাং বলা যেতে পারে প্রচলিত ব্যাকরণের এলাকা যেখানে শেষ, শৈলীবিজ্ঞানের এলাকা সেখান থেকে শুরু। এই বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গির অন্তরের মূল প্রেরণা হল লেখকের ব্যক্তিত্বের নিজস্বতা। যাকে সাহিত্যিক শৈলীইবশেষজ্ঞরা বলেছেন—idiosyncrasy।

প্রত্যেকটি শব্দের যেমন আভিধানিক অর্থ আছে, তেমনি আছে বাক্যের অন্তর্গত গঠনসাপেক্ষ অর্থ। কিন্তু শব্দগুলো যখন বিভিন্ন বাক্যে পরিবেশিত হয়, তখন বাক্যের রূপসজ্জা অনুসারে তার অর্থেরও পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন—

বালিকারা কুকুরটি ভালোবাসিত।

আবার কুকুরটি বালিকাদের ভালোবাসিত।

উপরের দুটি বাক্যে শব্দসজ্জার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাক্যের অন্তর্গত পরিবর্তন ঘটেছে। এখানে অবশ্য শব্দের আভিধানিক অর্থের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। সুতরাং বলা যেতে পারে—

শব্দের অর্থ = আভিধানিক অর্থ + বাক্যের সজ্জা অনুসারী অর্থ

আবার কবি বা সাহিত্যিকের সমগ্র রচনায় অনেক সময় একটি শব্দকে বহুবার আবর্তিত হতে দেখা যায়। এর ফলে শব্দমধ্যে আভিধানিক অর্থের সীমা ছেড়ে প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হয়। ইয়েটস্, রবীন্দ্রনাথ কেউই এর ব্যতিক্রম নন। জীবনানন্দ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় কিছু কিছু শব্দকে বারবার ব্যবহার করেছেন। যেমন—'শিশির' শব্দটি।

(১) সমস্ত দিনের শেষে **শিশিরের** শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে। (বনলতা সেন)

(২) হেমন্তের মাঠে মাঠে ঝরে
শুধু **শিশিরের** জল,
(পেঁচা)

(৩) আমার বুকের 'পরে সেই রাতে জমেছে সে **শিশিরের** জল।
(নির্জন স্বাক্ষর)

(৪) চোখের উপরে নীল মৃত্যু উজাগর
বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, **শিশিরের** ঘ্রাণ।
(রূপসী বাংলা)

আবার 'নক্ষত্র' শব্দটিও তিনি বারবার ব্যবহার করেছেন—

(১) সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের **নক্ষত্রের** কাছে।
(সুচেতনা)

(২) ...হৃদয়ে কামনা ব্যথা শেষ হয়ে গেছে কবে তার;
নক্ষত্রেরা চুরি করে নিয়ে গেছে, ফিরিয়ে দেবে না তাকে আর।
(জার্নাল-১৩৪৬)

(৩) ফিরে এসো সুরঞ্জনা
নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে;
(আকাশলীনা)

(৪) .... একদিন মৃত্যু এসে যদি দূর **নক্ষত্রের** তলে
অচেনা ঘাসের বুকে আমারে ঘুমায়ে যেতে বলে।
(দূর পৃথিবীর গন্ধ)

এখানে দেখা যাচ্ছে, জীবনানন্দ 'শিশির' ও 'নক্ষত্র' শব্দদ্বয় বারবার ব্যবহার করেছেন। কবির শৈলীসত্তার গুণে শব্দদুটি আভিধানিক অর্থকে অতিক্রম করে অনবদ্য চিত্ররূপময়ী দ্যোতনা প্রকাশ করেছে। এইভাবে কবি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় ঘ্রাণ, ঘুম, ঘাস, ক্লান্তি ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, অনেক শব্দই তাদের সামান্য অর্থের সীমাতিশায়ী হয়ে বাগ্‌প্রতিমা বা ইমেজের সৃষ্টি করে থাকে। যেমন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়—

শালবনের মধ্যে সুঁড়িপথ
লুটিয়ে চলেছে কাপড়ের মতো।
(শালবনে)

আবার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি কবিতায় দেখা যাচ্ছে, একটি শব্দই কবির রাজনৈতিক মানসের বিশেষ প্রতিফলন ঘটিয়েছে।

'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় 'লাল' শব্দটি ব্যবহারের মাধ্যমে কবির ব্যক্তিমানসের সঙ্গে গোষ্ঠীমানসের সম্মেলন ঘটেছে এবং শব্দটি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

শৈলীবিজ্ঞানে 'শব্দ' কতটা গুরুত্বপূণ৪, সেটা উপরিউক্ত আলোচনায় বোঝা গেল। সাম্প্রতিককালে 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' ও 'মনস্তাত্ত্বিকবিজ্ঞান'-এর অগ্রগতির ফলে শব্দপ্রয়োগে মানসিক ও সামাজিক ব্যাখ্যায় অনেকে দৃষ্টি দিয়েছেন। মনস্তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞানীর মতে, শব্দপ্রয়োগের সূত্র ধরে লেখকের বিশেষ মুহূর্তের মানচসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই মানসিকতারাই প্রকাশ ঘটে তাঁর নিজস্ব শৈলীতে।

গ. বাক্য : শৈলীচর্চায় শব্দ ও ধ্বনির পাশাপাশি বাক্যগঠনের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হয়। শব্দের মালা গেঁথেই সৃষ্টি হয় বাক্য। বাক্যের অবয়ব বিচারে শৈলীবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গি তন্ময়, নিরাসক্ত। চমস্কি তাঁর 'Aspects of the Theory of syntax' গ্রন্থে বলেছেন বাক্যের দুটি রূপ—

(১) অন্তরঙ্গ রূপ (Deep structure)

(২) বহিরঙ্গ রূপ (Surface structure)

চমস্কি বলেছেন যে, বচনে ও রচনে বক্তা বা লেখকের মনে ক্রিয়াশীল থাকে বাক্যের অন্তরঙ্গ রূপ, তার প্রকাশ ঘটে বহিরঙ্গ রূপে। একটি বাংলা বাক্যে 'হওয়া' ক্রিয়াপদটি উহ্য থাকে। এটি বাক্যের অন্তরঙ্গ রূপের অন্তর্গত। যেমন—

(ক) সায়ক ভাল ছেলে। (বহিরঙ্গ রূপ)

(খ) সায়ক (হয়) ভাল ছেলে। (অন্তরঙ্গ রূপ)

বর্তমানে 'হওয়া' ক্রিয়াপদটি উহ্য থাকলেও বাংলা গদ্যের শুরুতে লেখকরা বাংলা বাক্যের অন্তরঙ্গ রূপ ব্যবহার করেছিলেন—

(ক) সে **হয়** উত্তম দাতা। (রামরাম বসু)

(খ) আমি বেকার **আছি**। (উইলিয়াম কেরী)

অনেক সময় ইংরেজি বাক্যের বহিরঙ্গ রূপ অনুসরণে বাংলা বাক্যে নিত্য বা পরস্পর সম্বনতথী অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—

(ক) 'না এ পর্যন্ত তিনি আসিলেন, না কিঙ্করই ফিরিয়া আসিল'।

(ভ্রান্তিবিলাস ২য় অধ্যায়)

কখনও বা ইংরেজি বাক্য অনুসারে বাংলায় যখন (when) তখন (then) শব্দদুটির প্রথমটি ব্যবহৃত হয়। অতঃপর ইংরেজি বাক্যের অন্তরঙ্গ রূপ অনুসরণে 'তখন' উহ্য রাখা হয়। এটাও একধরনের বাক্যগঠনগত শৈলী। যেমন—

(ক) কালু যখন এল, বিপ্রদাস তার হাতে একখানা চিঠি দিলে।

(যোগাযোগ)

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যাবলীর প্রাথমিক সজ্জার প্রকৃতি পরীক্ষা করেছেন। সেখানে মোটামুটি ছয় ধরনের সজ্জার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। Subject-কে 'S' Object-কে 'O' এবং verb-কে 'V' দিয়ে বিষয়টা চিহ্নিত করা যেতে পারে—

(১) কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV)

(২) কর্তা-ক্রিয়া-কর্ম (SVO)

(৩) ক্রিয়া-কর্তা-কর্ম (VSO)

(৪) কর্ম-কর্তা-ক্রিয়া (OSV)

(৫) ক্রিয়া-কর্ম-কর্তা (VOS)

(৬) কর্ম-ক্রিয়া-কর্তা (OVS)

বাংলা বাক্যে সাধারণভাবে ক্রিয়ার অবস্থান কর্তা ও কর্মের পরে। কিন্তু ইংরেজি বাক্যে ক্রিয়ার অবস্থান কর্তা ও কর্মের মাঝখানে। বিশ্বের ভাষাসজ্জার চিত্র লক্ষ্য করলে, প্রথম তিনটি সজ্জার প্রাধান্যই দেখা যায়। বাংলা বাক্যের ক্ষেত্রে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার সজ্জাবৈচিত্র্যেরই বিষয়টি শৈলীবিজ্ঞানসম্মত আলোচনার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ সজ্জাবৈচিত্র্যের সঙ্গে শৈলীবৈচিত্র্য সম্পর্কান্বিত। একটা বাংলা বাক্য দিয়ে বিষয়টা বোঝানো যেতে পারে—

আশিস লাঠির আঘাতে বিশ্বজিতের মাথা ফাটিয়েছিল।

এই বাক্যটিতে ব্যাকরণগত উপাদানের মধ্যে আছে কর্তা বা কর্তৃকারক (আশিস); করণকারক (লাঠির আঘাতে); সম্বন্ধ পদ (বিশ্বজিতের); কর্ম বা কর্মকারক (মাথা) এবং ক্রিয়াপদ (ফাটিয়েছিল)। এই বাক্যটিকে আবার অন্যান্য পদসজ্জায় সাজিয়েও বাক্যের শৈলী নির্ধারণ করা যায়।

৪০৫.১.১.৬ : সাধারণ শৈলীবিজ্ঞানে শৈলী

এবারে একটু অন্য প্রসঙ্গে শৈলীর চর্চা করা যেতে পারে। কারণ সাহিত্যের মাধ্যমে তো আর একটি নয়, একাধিক। যেমন গদ্যশৈলীর মধ্যে পড়ে ছোটগল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। রচনাগত ভিন্নতার জন্য এক একটির শৈলী এক একরকম। গদ্য পদ্যের বিপরীত। তাই বলা যায়, যা পদ্য নয়, তাকেই গদ্য বলা যায়। ভাষার যেমন জ্ঞানমূলক এবং সৃষ্টিমূলক দিক আছে, গদ্যেরও তাই। গদ্যের আওতায় পড়ে লিখিত ভাষণ, চিঠি, নাটক, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি। এখানে মূলত ছোটগল্প ও উপন্যাসের গদ্যশৈলী আলোচনা করা হল—

ক. ছোটগল্প :

কোনো ছোটগল্পের প্রাণই হল প্রসঙ্গ ও প্রকরণের একতা। কারও কাছে ছোটগল্প সহজ-সরল প্রাঞ্জল রচনা। কারও কাছে বা তা চাবুকের কড়া আঘাত। এখানে উপন্যাসের মতো চরিত্রের ভিড় থাকে না। কিন্তু লেখকের একটা দায় থাকে। গল্পটাকে সংকটের কাছাকাছি আনার। সরল বা জটিল থেকে জটিলতর প্রান্তে দ্রুততলে উপসংহারে নিয়ে যাবার. এই দায়বদ্ধতার উপরেই লেখকের নিজস্ব স্টাইল বা শৈলী ধরা পড়ে। ছোটগল্পের মিতায়তনও কখনও কখনও উপন্যাসের চেয়েও উঁচুদরের প্রত্যক্ষতা দান করে। আর এখানেই ছোটগল্পকারের শৈলীগত ভিন্নতা। যেমন ধরা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পটা। এই গল্পে মূল শাস্তি পেয়েছে চন্দরা। মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত চন্দরা। ফাঁসির আগে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিগ্যেস করেন যে তার স্বামী তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তিনি ডেকে দেবেন কি? এর প্রত্যুত্তরে চন্দরার সংক্ষিপ্ত জবাব-'মরণ'। অর্থাৎ এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো। মাত্র একটা শব্দের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ স্বামীর প্রতি চন্দরার তীব্র ঘৃণামিশ্রিত অভিমান প্রকাশ করিয়েছেন। তার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হয়ে দাঁড়াল। এই মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে 'মরণ' কথাটিতে। আর এখানেই ধরা পড়েছে ছোটগল্পে রবীন্দ্রশৈলী। তা চাবুকের কড়া আঘাতের মতো সমাজকে বিদ্ধ করেছে। সামান্য এখটা শব্দ গল্পমধ্যে অসামান্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

খ. উপন্যাস :

উপন্যাসের মতো বিমিশ্র সাহিত্য মাধ্যম খুব কমই আছে। ছোটগল্পের তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা, কবিতা, নাটকীয় সংলাপ, চিঠিপত্র, বর্ণনাত্মক গদ্য, জ্ঞানমূলক গদ্য সবই আছে উপন্যাসে। চরিত্র, সংলাপ, ভাষা, অবয়ব, উপলক্ষ, আলোচনা সব মিলেই উপন্যাসের শিল্পজগৎ। বিভিন্ন ঔপন্যাসিক এগুলো বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে থাকেন। তাই সেখানেই উপন্যাসের শৈলী বিভিন্ন হয়ে যায়।

ক্রিয়ার কালের প্রয়োগ পার্থক্যের সঙ্গে বাক্যের রূপগত ও অর্থগত পরিবর্তন শৈলীচর্চার অন্তর্গত। সাধারণত উপন্যাসের কাহিনীসজ্জায় ক্রিয়ার কালের ব্যবহার দুটি দৃষ্টিকোণ অনুসৃত হয়।

(১) পাঠকের সময় সাপেক্ষে ক্রিয়ার কাল।

(২) লেখকের সময় সাপেক্ষে ক্রিয়ার কাল।

বর্ণনামূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকেরা সাধারণত পাঠকের সময় সাপেক্ষে ক্রিয়ার অতীত রূপের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। যেমন—

(ক) হরিদ্রাগ্রামে একঘর বড় জমিদার ছিলেন। (কৃষ্ণকান্তের উইল, বঙ্কিমচন্দ্র)।

ইংরেজি বাক্যে—

A. The unusual events described in the chronicle occurred in 1947, at Oran, Everyone agreed that, considering their some what extraordinary character, they were out of place there.

(The Plague, Albert Camus)

আবার কখনও লেখকের সময় সাপেক্ষে ক্রিয়ার কালের রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। উপন্যাস জুড়ে অতীতকালাশ্রয়ী বাক্য থাকলেও উপক্রমণিকা অংশে বর্তমান কালের রূপ পরিলক্ষিত—

(ক) অতি বিস্তৃত অরণ্য। অরণ্য মধ্যে অধিকাংশ বৃক্ষই শাল, কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও অনেক জাতীয় গাছ আছে। (আনন্দমঠ, বঙ্কিমচন্দ্র)

আবার ইংরেজি উপন্যাসের একটি বাক্যে প্রথমে ক্রিয়ার অতীতরূপ ব্যবহৃত, পরক্ষণেই ক্রিয়ার ভবিষ্যৎ কালের রূপ ব্যবহৃত হয়েছে—

(a) .....and which I shall describe in its proper place.

(The Brothers Karamazov, Dostoyevsky)

আবার 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ কখনও কখনও গতানুগতিকতা থেকে যুক্ত হয়ে লেখকের সময় সাপেক্ষে ক্রিয়ার বর্তমানকাল ব্যবহার করেছেন—

(ক) অমিতকে আমি পছন্দ করি। খাসা ছেলে।

ঠিক এর পরেই অনেকটা জায়গা জুড়ে রবীন্দ্রনাথ 'অমিত বলে..../সিসি বলে ..../লিসি বলে....' ধরনের বর্তমান কালাশ্রয়ী বাক্য ব্যবহার করেছেন। আর এখানেই ধরা পড়েছে, উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের শৈলীচর্চা।

ধরা যাক, 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসের কথা। শশী কলকাতার পাশ করা ডাক্তার। গাঁয়ের মেয়ে কুসুম ঘরের কেউ। শশীর প্রতি কুসুমের প্রেম আপনা থেকে জেগেছিল। একদিন তালবনে কুসুমকে ডেকে উতলা শসী জিগ্যেস করল, "তোমার কি হয়েছে বুঝতে পারছি না বৌ।" উত্তরে স্পষ্ট ভাষায় কুসুম বলল, "কি করে বুঝবেন? .....হলেনই বা ডাক্তার। এ তো জ্বর জ্বালা নয়। .....কতবার নিজে যেচে এসেছি।" তারপরেই কুসুমের কঢ়া ভাষায় জবাব, "আজ হাত দরে টানলেও আমি যাব না।...লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না? কাকে ডাকছেন ছোটবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে। কুসুম কি বেঁছে আছে। সে মরে গেছে।"

টকটকে লাল তাতানো লোহার ঠাণ্ডা হয়ে যাবার অন্তরালে লেখক যেভাবে কুসুমের দশ বছরের উপবাসী ভালাবাসার মৃত্যু ঘটিয়েছেন তা কল্পনাতীত বিস্ময়কর। সহজ সরল বাক্যের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শৈলীচর্চা।

৪০৫.১.১.৭ : শৈলীবিজ্ঞানে শৈলীর বহুরূপতা

গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে শৈলীর বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম। তাই শৈলী বা

স্টাইলের 'লোকমান্য' (Popular) সংজ্ঞা দান করা খুবই কঠিন কাজ। কারণ লেখক, বিষয়, পাঠক, উদ্দেশ্য, শ্রেণি ইত্যাদি ভেদে স্টাইল পরিবর্তন হয়ে যায়। এর কোনোটিতেই আলাদা করে এককথায় স্টাইলের ব্যাখ্যা করা যায় না। এবারে সেটা আলোচনা করা যেতে পারে—

১. **লেখক ও শৈলী :** প্রত্যেক লেখকের চিন্তা চেতনা বিভিন্ন। ধ্বনিবিন্যাস, শব্দসংস্থান, বাক্যযোজনা, স্তবক রচনা, রচনার শুরু ও শেষে ওই পৃথকত্ব ধরা পড়ে। লেখকভেদে চিন্তাচেতনা পৃথক হবার ফলেই শৈলীও বিভিন্ন হয়।

২. **বিষয় ও শৈলী :** অনেক সময় দেখা যায়, বিষয়ই লেখকের ভাষারীতি নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলেই গবেষণা পত্রের ভাষা ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ভাষা আলাদা হয়ে যায়। এই জন্যই ঐতিহাসিক উপন্যাস ও রাজনৈতিক উপন্যাসের শৈলী আলাদা। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' ও 'ঘরে বাইরে'-এর শৈলী বিভিন্ন মাত্রার।

৩. **পাঠক ও শৈলী :** লেখকরা রচনা পাঠকের রুচি অনুযায়ীও ভিন্ন শৈলীর হয়ে যায়। সাহিত্যবিষয়ক, ক্রীড়াবিষয়ক, সিনেমাবিষয়ক, বিজ্ঞানবিষয়ক, ইত্যাদি রচনার পাঠক বিভিন্ন। অভিপ্রেত পাঠকের রুচি অনুসারে কিছু লিখলেই শৈলীর পার্থক্য ঘটে যায়।

৪. **উদ্দেশ্য ও শৈলী** কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে লেখকদের কলম ধরতে হয়। কারও উদ্দেশ্য সাহিত্যবোধ জাগানো, কারও আনন্দ দেওয়া, কারও দেশপ্রেম জাগানো, কারও দেশের লুপ্ত সংস্কৃতি জাগিয়ে দেওয়া, কারও বা উদ্দেশ্য প্রচলিত প্রথা ভেঙে নতুন কিছু প্রতিষ্ঠিত করা। ভিন্নমাত্রার উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই লেখকদের শৈলী এক হতে পারে না।

৫. **শ্রেণি ও শৈলী :** সাহিত্যের শ্রেণি অনুযায়ী শৈলী আলাদা হয়ে যায়। এই পর্যায়ে ভাব অনুযায়ী শব্দচয়নই এর মূলকথা। ফলে, প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটকের শৈলী আলাদা।

এর থেকে বলা যায়, একজন লেখকের বিষয় ও রচনাভেদে স্টাইল বিভিন্ন রকম হয়। আবার সময়ান্তরে স্টাইলও পরিবর্তিতহয়। তবে এর মধ্যে দিয়েই ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলীর ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যায়।

৪০৫.১.১.৮ : শৈলীবিজ্ঞান : ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলী

উইলিয়াম কেরী থেকে আধুনিককালের লেখকদের রচনা বিশ্লেষণ করলে দুধরনের শৈলীর প্রসঙ্গ মনে পড়ে। ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলী। সাধারণ ওইসব লেখকের সবচেয়ে পরিচিত রচনার পরিসংখ্যানগত লক্ষণ দেখেই ধরা যায় লেখকদের শৈলী। অর্থাৎ রচনারীতির মধ্যে 'identific' ব্যাপারটাই লেখককে কোনো না কোনো বাবে চিনিয়ে দেয়। তাই অনেক সময় নাম বা দেওয়া রচনা দেখেই বলা যায়, এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বা বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বা প্রমথ চৌধুরী বা সমরেশ বসুর লেখা।

অনেক সময় লেখকের নিজস্ব রনচা লক্ষণগুলো খুবই সুস্পষ্ট থাকে। যার জন্য Pun প্রবণতামূলক গল্পগুলো শিবরাম চক্রবর্তীর মনে হয়। আবার বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 'তথ্যমূলক' রচনা মানেই সত্যজিৎ রায়ের লেখা। কোনো রচনায় 'দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই ইত্যাদি শব্দ বা উদিপুরী, হাস্যময়ী, রহস্যময়ী ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার চিনিয়ে দেয় বঙ্কিমচন্দ্রকে। এগুলো রীতির নির্দোষ সীমানা ছাড়িয়ে উৎকেন্দ্রিকতার গণ্ডীতে পৌঁছে গেছে।

আর এর থেকেই উদ্ভব হয়েছে বঙ্কিম রীতি, বিদ্যাসাগরীয় রীতি, হুতোমী রীতি বা রবীন্দ্ররীতি। এইসব লেখকের অনুগামী লেখকদের রচনায় বিভিন্ন সময়ে সৃষ্টি হয়েছে যুগশৈলী।

শব্দের রূপগত দিক বিচার করেও ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলী উদ্ঘাটন করা যায়। কেরী থেকে বিদ্যাসাগরের রচনায় ক্রিয়াপদের অতীত ও ভবিষ্যৎকালের রূপের সঙ্গে 'ক'-এর অতিরিক্ত সংযোগ লক্ষ করা যায়। যেমন—ক্রিয়াপদের অতীতকাল—করিলেক, মানিলেক, বলিলেক ইত্যাদি। আবার ভবিষ্যৎকালের রূপ—জন্মিবেক, হইবেক, আসিবেক ইত্যাদি।

বাক্যসজ্জার দিক থেকেও ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলীর ধারণাটা স্পষ্ট হয়। উনিশ শতকের বাংলা গদ্যে খণ্ড বাক্যসজ্জার রীতি হল—প্রধান খণ্ডবাক্য + অধীন খণ্ডবাক্য অথবা অধীন খণ্ডবাক্য + প্রধান খণ্ডবাক্যের ব্যবহার। বর্তমানকাল বাক্যের তন্বীরূপই আমরা প্রত্যক্ষ করি। ছোট ছোট সরল বাক্য, তার সঙ্গে সহজ-সরল আটপৌরে শব্দ ব্যবহারে স্পষ্ট হয়ে যায় ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলী। সাধারণ মানুষ হয়তো লিখবেন "শুষ্কং কাষ্ঠং...." আর কালিদাস লিখবেন 'নীরস ঃ তরুবরঃ.....। এই পার্থক্যই ব্যক্তিশৈলীর মূল কথা। আর ভাষা প্রয়োগের তন্নিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তি বা যুগের শৈলী সন্ধানই শৈলীবিজ্ঞানের উপজীব্য।

৪০৫.১.১.৯ : উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, ভিন্ন ভিন্ন রচনারীতিতে আলোচনা করাই শৈলীবিজ্ঞানের কাজ। এর ফলে সাহিত্য সমালোচনা হয়ে ওঠে তন্ময় ও বৈজ্ঞানিক। শৈলীবিজ্ঞান একদিকে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের সহায়তায় বাক্যের রূপগত ও অর্থগত দিকটি আলোকিত করে তোলে। অন্যদিকে পরিসংখ্যানের সহায়তায় শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য ব্যবহারের বিশেষ প্রবণতা বিষয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। এটা ঠিক, লেখকের বিষয় এ রচনাভেদে শৈলী বিভিন্ন প্রকার হয় বলে 'শৈলীবিজ্ঞান' শব্দটি সর্বজনসম্মত নয়। যদিও সর্বজনগ্রাহ্য পরিভাষা বাংলায় বেশি দেখা যায় না। তবুও বিতর্কাভাস সম্ভাব্য জেনেও 'শৈলীবিজ্ঞান' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়। আমাদের এই প্রশ্নের মীমাংসা তখনই হবে যকন 'শৈলীবিজ্ঞান' নিত্য-অনুশীলন সাপেক্ষ একটি শৃঙ্খলায় পরিণত হবে।

৪০৫.১.১.১০ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। শৈলী বলতে কী বোঝো? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবনায় শৈলীর স্বরূপ আলোচনা করো।

২। শৈলীবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ করে শৈলীবিজ্ঞানের প্রণালীতত্ত্ব আলোচনা করো।

৩। শৈলী সৃষ্টিতে কাব্যের মধ্যে শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করে বুঝিয়ে দাও।

৪। শৈলী থেকে কীভাবে শৈলীবিজ্ঞানের সূচনা হয়েছে? একই সঙ্গে উপন্যাসে শৈলীসৃজনে বাক্যের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৫। শৈলীবিজ্ঞানে শৈলীর বহুরূপতা আলোচনা করে ব্যক্তিশৈলী ও যুগশৈলীর পরিচয় দাও।

৪০৫.১.১.১১ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩)—ড. রামেশ্বর শ্, পুস্তক বিপণি

২। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭)—আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ

৩। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪)—অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়

৪। 'বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস্' (২০০১)—নব্যেন্দু সেন, মহাদিগন্ত

৫। 'শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৮)—অপূর্ব দে, মডার্ন বুক এজেন্সি

৬। 'সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান' (১৯৯৪)—আশিস দে, পুস্তক বিপণি

৭। 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড) ২০২১, সুখেন বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং

৮। 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড) ২০২২, সুখেন বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং

৯। ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ (২০২২), সুখেন বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক-২

অভিধানবিজ্ঞান

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.১.২.১ : প্রস্তাবনা

৪০৫.১.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.১.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.১.২.১ : প্রস্তাবনা

পৃথিবীর আপামর জনসাধারণের প্রতিদিনের সঙ্গী অভিধান। পদ বা শব্দ শুদ্ধতার শেষ কথা অভিধান। কারণ অভিধানের মাধ্যমেই শব্দের বানান, উচ্চারণ, ব্যুৎপত্তি, অর্থবৈচিত্র সবকিছুই জানা যায়। বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে অভিধান তো অমূল্য গ্রন্থ।

আমরা জানি, ভাষা নিয়ত পরিবর্তনশীল। যুগে যুগে কালে কালে দেশে-দেশে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের বানান, উচ্চারণ, অর্থ, প্রয়োগরীতি ইত্যাদি পাল্টে যাচ্ছে। সেই ধারা এখনও অব্যাহত। তাই শব্দাবলীকে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে বাধার উদ্দেশ্যে বা ভাষার শুদ্ধরূপ যথাযথ রাখতে অভিধান রচনার প্রয়াস দেখা যায়। রচয়িতা ও ব্যবহারকারী উভয়ের কাছেই 'অভিধান' একটি আনুশাসনিক গ্রন্থ। রচয়িতারা যেমন শব্দাবলীকে শুদ্ধ রীতিতে অভিধানের মাধ্যমে গ্রন্থবদ্ধ করেন, ঠিক তেমনভাবেই ব্যবহারকারীরা ওই শব্দাবলীকে রচয়িতাদের মতো করেই পেতে চায়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে বিশৃঙ্খল শব্দরাশি ছড়িয়ে আছে তাকে সুশৃঙ্খল করে একটি মানদণ্ডে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যেই অভিধানের সৃষ্টি।

এক.

অভিধানের ইতিহাস বহু প্রাচীনকালের। এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে প্রাচীন ভারতবর্ষ। বৈয়াকরণ যাস্কই ছিলেন প্রথম অভিধানকার। তিনি পাণিনি পূর্বে আবির্ভূত হয়ে বৈদিক শব্দাবলীর অভিধান রচনা করেছিলেন। শুধু তাই নয় সেইসব শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি নির্ণয়েও তাঁর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। তাঁর গ্রন্থটির নাম ছিল 'নিরুক্ত'। আধুনিক ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ লক্ষ করা যায় সেখানে গ্রন্থের শেষে 'নিঘন্টু' নামে যে তালিকা পাওয়া যায় তা সেই প্রাচীন ভারতীয় অভিধান রচনার ধারাকেই বহন করে চলেছে। এরপর তো অমরসিংহের 'অমরকোষ', 'নামলিঙ্গানুশাসন' বিশেষভাবে বিখ্যাত। পরবর্তীকালে কখনও ব্যক্তিগত উদ্যোগে, কখনও বা প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে অভিধান রচিত হয়েছে। মধ্যযুগে অভিধান রচনার প্রথম প্রয়াস লক্ষ করা যায় ইতালিতে। এখানে ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলীর একটা নির্দিষ্ট শুদ্ধরূপ প্রতিষ্ঠিত করার নিরিখেই অভিধান লেখা হয়েছিল। ইতালির 'আকাদেমিয়া দেল্লা ক্রুস্কা' এই উদ্যোগ নিয়েছিল ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে। এখান থেকে প্রকাশিত অভিধানটির নাম 'ভোকাবোলরিও ডেইলি আকাদেমিচি ডেল্লা ক্রুস্কা' (১৬১২)। এটি আজও মধ্যযুগের প্রথম অভিধান গ্রন্থ হিসাবে বিখ্যাত। ভাষার শুদ্ধরূপ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় দেশ হিসাবে ফ্রান্সের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানেও ইতালির অনুসরণে 'ফরাসি আকাদেমি' (১৬৩৫) প্রতিষ্ঠিত হয়। অভিধান রচনার ক্ষেত্রে ফরাসিদের উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি ও প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত ফরাসি শব্দাবলীর শুদ্ধ মার্জিত রূপ প্রতিষ্ঠা করা। সেটাও সম্ভব হয়েছিল ইতালিদের প্রচেষ্টায়। অর্থাৎ বলা যায় মধ্যযুগে বিশৃঙ্খল শব্দাবলীর সুশৃঙ্খল, মার্জিত মান্যরূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই অভিধান শিরোনামাঙ্কিত গ্রন্থাবলীর সৃষ্টি করেছিলেন এঁরা।

পরবর্তীকালে এই ধারার প্রভাব পড়ে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে। সেখানকার কয়েকজন মনীষী ইতালি ও ফরাসি অকাদেমির আদলে তাঁদের দেশেও অকাদেমি সৃষ্টির চেষ্টা করতে থাকেন। এই উদ্দেশ্যে সুইফট ড্রাইডেন জনসন ইংরেজি অকাদেমি স্থাপন করেন। কিন্তু সেটি সম্ভব না হলেও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ইংরেজি ভাষার বিশুদ্ধতা, উন্নয়ন ও আদর্শ মান্যরূপকে গ্রন্থবদ্ধ করার চেষ্টা করেন জনসন। তিনি একটি অভিধান প্রণয়ন করেন যার নাম 'A Dictionary of the English Language' (1755)। এখানে ইংরেজি শব্দাবলীর উচ্চারণ, অর্থ, ব্যবহারবিধি ইত্যাদি সুচারুভাবে আলোচিত হয়েছে। জনসনের অভিধানের সঙ্গে ইতালি বা ফরাসি অকাদেমির অভিধানের পার্থক্য ছিল এইরূপ। যেমন একক প্রচেষ্টায় জনসন তাঁর অভিধানটি রচনা করেছিলেন। কিন্তু ইতালি বা ফ্রান্সে অকাদেমির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল তাদের অভিধানগুলি। জনসনের অভিধানটি ছিল ইংরেজি ভাষার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। জনসন ইংরেজি শব্দাবলীর বিধানকর্তা হিসাবে যেন আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন তাঁর সৃষ্ট অভিধানে শব্দ উচ্চারণ প্রণালী, অর্থ, ব্যুৎপত্তির বিষয়টা চিরদিন ইংরেজি সাহিত্যে ধ্রুব হয়ে থাকবে। কিন্তু পরিবর্তনশীল ভাষার খামখেয়ালিপনার জন্যেই কালে কালে তাঁর ইংরেজি ভাষার অভিধান অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে। কিন্তু অভিধান রচনার যে শৈলী বা প্রয়োগগত ধারা তিনি রেখে গেছেন তা আজও আদর্শ হয়ে আছে। অভিধান অর্থেই শব্দের বানান, উচ্চারণ, অর্থ, ব্যুৎপত্তি সবই একাকার হয়ে গেছে।

এরপরে ইংরেজি ভাষার অভিধান রচনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এমার্সন, ফাউলার প্রমুখ। এঁরা নির্ভুলভাবে ইংরেজি শব্দাবলীর প্রতিশব্দ ও ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছিলেন। তবে শুধু ইংরেজি ভাষায় নয়, সমগ্র পৃথিবীতে যে অভিধানটি এখনও বিখ্যাত হয়ে আছে সেটি 'Oxford English Dictionary'। এই অভিধানের আদি নাম ছিল 'A New English Dictionary on Historical Principles'। এখানে শব্দের ব্যুৎপত্তি বা অর্থ নিরূপণের নতুন ধারা লক্ষণীয়। এটি বর্ণনামূলক ও ঐতিহাসিক অভিধান হিসাবে পরিচিত। তেরোটি খণ্ডে এই অভিধানটি বিন্যস্ত।

চার লক্ষেরও বেশি শব্দ বিশিষ্ট এটি। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা থেকে অভিজাত অথচ প্রয়োজনীয় শব্দাবলী নিয়ে এটি গঠিত। প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৪ সালে। আর ১৩তম খণ্ডটি ১৯২৮-এ। এরপর থেকে পৃথিবীর বহু ভাষায়ই অসংখ্য অভিধান প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা, হিন্দি, রুশ ইত্যাদি ভাষার অভিধান এই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দুই.

ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অভিধানকে মূলত তিনটি ধারায় বিভাজন করা যায়। যেগুলি এইরকম—অর্থাৎ ঐতিহাসিক, বর্ণনামূলক ও রূপান্তরমূলক-সৃজনমূলক।

১) ঐতিহাসিক অভিধানে ভাষার ইতিহাসকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ শব্দাবলীর উৎস, ইতিহাস, ক্রমবিবর্তনের রূপরেখা ইত্যাদি। যেদিন থেকে শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকে অভিধান রচনার কাল অবধি সেই সমস্ত ভাষার শব্দাবলীর রূপ, অর্থ, ইতিহাস, উচ্চারণ, ব্যুৎপত্তির বিভিন্ন প্রসঙ্গ যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ বলা যায় ঐতিহাসিক দিককে গুরুত্ব দিয়েই এই অভিধান রচিত।

২) বর্ণনামূলক অভিধানে সাধারণত কোনও ভাষার শব্দাবলীর অপ্রচলিত সেকেলে রূপ দেওয়া হয়। এখানে নিরাসক্ত, নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠকারী হন অভিধান রচয়িতা। এটা মূলত ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত। এই অভিধানে থাকে নিত্য ব্যবহার্য শব্দাবলী। এর ভাষাও বাস্তব। তা ছাড়া বর্ণনামূলক অভিধান আদর্শমূলকও হতে পারে। এখানে থাকে আদর্শ শিষ্ট ভাষার শব্দ তালিকা। সাধারণত এই সব শব্দ নেওয়া হয় ঐতিহ্যমণ্ডিত সাহিত্য ও বিজ্ঞানচেতনার বিভিন্ন শাখা থেকে। বাস্তবজীবনের মৌখিক, লিখিত ইত্যাদি রূপই এর আদর্শ।

৩) রূপান্তরমূলক-সৃজনমূলক অভিধানের সন্ধান পাওয়া না গেলেও এখনও সেই চেষ্টার ধারা অব্যাহত। এই ধারার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় চমস্কির ব্যাকরণে। তিনি আভিধানিক উপকক্ষের কথা বলেছেন। অর্থাৎ তিনি এই ধরনের অভিধানে শব্দাবলীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লিখে রাখার পক্ষপাতী। যেমন এখানে থাকবে শব্দের ধ্বনিক রূপ, অর্থগত রূপ ও বাক্যিক রূপ। এবং দেখাতে হবে সেই শব্দ কতটা সৃজনশীল। তাহলেই এই ধরনের অভিধান রচনা করা সম্ভব। কিন্তু এই পদ্ধতিতে অভিধান রচনা আদৌ সম্ভব কিনা সেটা এখনও ভাববার বিষয়।উপরে ভাষাতত্ত্বগত দিক থেকে অভিধানের শ্রেণিবিভাগ করা হল।

বিষয়গত দিক থেকে অভিধানের শ্রেণিবিভাগ করা যেতে পারে। সেটি মূলত দশ প্রকার। নিচে উদাহরণসহ বিষয়টি লিপিবদ্ধ করা হল

১) সাধারণ এই ধরনের অভিধানে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক অর্থাৎ সমাজজীবনের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কিত সব ধরনের শব্দই স্থান পায়। সেই সব শব্দের বানান, ব্যুৎপত্তি, অর্থ, উচ্চারণ, প্রয়োগ সবই থাকে। এই ধরনের অভিধান একভাষী, দ্বিভাষী, বহুভাষী হতে পারে। একভাষী অভিধানে কোনও ভাষার শব্দের অর্থ, উচ্চারণ, প্রয়োগগত দিক, ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি থাকে।

দ্বিভাষী অভিধানে দুটি ভাষার সাহায্য নেওয়া হয়। একটি ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় যে অর্থ দাঁড়াচ্ছে তার নিয়মরীতি, প্রয়োগগত দিক সবই ব্যাখ্যা করা হয়। ধরা যাক 'Bengali to English Dictionary' বা 'English to Bengali Dictionary'-র কথা।

এখানে বাংলা বা ইংরেজি শব্দাবলীর অর্থ নির্ণয় করতে হলে ইংরেজি বা বাংলা শব্দ দিয়ে তা করা হয়। অর্থাৎ অর্থগত দিক, প্রয়োগগত দিক সবই এখানে বিশ্লেষণ হয়ে থাকে।

বহুভাষী অভিধানে দুইয়ের বেশি ভাষার শব্দাবলী অভিধানে স্থান পেয়ে থাকে। এখানে কোনও ভাষার শব্দ কমপক্ষে দুটি ভাষাতে তার অর্থ কী দাঁড়ায় সেটা বিশ্লেষণ করা হয়। ধরা যাক 'Bengali to Hindi English Dictionary'-এর কথা। এখানে বাংলা ভাষার কোনও শব্দ হিন্দি ও ইংরেজিতে কী অর্থ দাঁড়াবে, তার প্রয়োগগত দিকই বা কেমন হবে তা বিশ্লেষিত হয়।উল্লেখ্য সাধারণ একভাষী অভিধানে কয়েকটি শ্রেণি লক্ষণীয়। যেগুলি মূলত বিষয়, উপস্থাপন বা প্রয়োগরীতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। যেমন—বানান অভিধান এই ধরনের অভিধানে বর্নাক্রম অনুযায়ী শুদ্ধ ও মার্জিত রূপের বানান লেখা থাকে। পাশাপাশি ব্যবহারিক দিক থেকে সেই বানান কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানের রূপ পেয়েছে তাও বর্ণিত হয়। বোঝা যাচ্ছে এই ধরনের অভিধানে বানানই মুখ্য। আঞ্চলিক অভিধান এখানে কোনও বিশেষ অঞ্চলের শব্দাবলীকে স্থান দেওয়া হয়। এর সঙ্গে শিষ্ট বা আদর্শ অভিধানের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। কারণ সেই অঞ্চলের শব্দাবলীর সঙ্গে আদর্শ অভিধানের কোনও যোগই নেই।উচ্চারণ অভিধান শব্দ কীভাবে উচ্চারিত হবে অথবা শব্দে ব্যবহৃত স্বর বা ব্যাঞ্জনের উচ্চারণরীতির নির্দেশাবলী থাকে এই ধরনের অভিধানে। এখানে সমোচ্চারিত শব্দাবলীও স্থান পায়। পাশাপাশি শোভা পায় তাদের অর্থও।

২) শব্দার্থগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে শব্দার্থ অভিধান এখন খুবই প্রচলিত। কারণ এখানে মূলত কোনও ভাষার শব্দাবলীর সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দের ইত্যাদি দিক বিশ্লেষিত হয়।

৩) প্রয়োগমূলক অভিধান : এই ধরনের অভিধানে শব্দাবলীর প্রয়োগরীতির দিক নির্দেশিত হয়। অর্থাৎ কোন শব্দ কীভাবে কোথায় যথার্থরূপে প্রয়োগ করা যাবে তার নির্দেশ থাকে এখানে।

৪) শব্দসৃজনমূলক অভিধানে প্রতিনিয়ত প্রত্যেক ভাষায় অসংখ্য শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ওই সমস্ত শব্দ নিত্য নতুন ব্যঞ্জনা, ইশারা বা ভিন্নার্থক ইঙ্গিতের পরিচয়বাহী। সাধারণত কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই ধরনের শব্দ তৈরি করে চলেছে। এই ধরনের অভিধানে থাকে তারই নির্দেশাবলী।

৫) শব্দ-সঙ্কেত অভিধানে কোনও ভাষার সাধারণ শব্দাবলীকে আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার উচ্চারণরীতি ও পদপরিচয় দেখিয়ে অর্থ নির্ণয়ের ব্যাপারটা অভিধানগুলিতে দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের অভিধানও বাংলা ভাষায় লেখা হচ্ছে।

৬) সমগোত্রীয় শব্দাভিধানে থাকে সমগোত্রীয় শব্দসমূহ। যেমন—ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা অভিধান, অসমিয়া অভিধান, ওড়িয়া অভিধান, মরাঠি অভিধান ইত্যাদি।

৭) কৃতঋণ শব্দাভিধানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত ভাষাতেই কৃতঋণ শব্দাবলীর আনাগোনা লক্ষণীয়। ধরা যাক বাংলা ভাষার কথা। এখানে ইংরেজি, আরবি, ফারসি, পর্তুগিজ বিভিন্ন ভাষার শব্দাবলী স্থান পেয়েছে। এই সব শব্দকে একত্র করে কৃতঋণ শব্দাভিধান রচিত হয়েছে।

৮) বাগধারা ও প্রবচনমূলক অভিধানে পৃথিবীর সব ভাষাতেই অসংখ্য বাগধারা ও প্রবাদ-প্রবচন ছড়িয়ে আছে। বাগধারা প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে কোনও ভাষার ঐতিহ্যকে সহজেই বোঝা যায়। তা ছাড়া এগুলি কোনও বিষয়ের একটি বিশেষ অর্থও প্রকাশ করে। আর প্রবাদ-প্রবচন যুগ যুগ ধরে একটি শাশ্বত অর্থে প্রযুক্ত হয়ে আসছে। এই সব নিয়েও সাম্প্রতিক কালে অভিধান লেখা হচ্ছে।

৯) চরিতাভিধানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্ম, মৃত্যু, সৃজনশীলতা, ব্যক্তিজীবন ইত্যাদি নিয়ে লেখা হয়েছে। এগুলিও বর্ণনাক্রমে সাজানো। এই ধরনের অভিধানে এক ঝলকেই বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে সাধারণ তথ্যাবলী পাওয়া যায়। বর্তমানে যে কোনও ভাষায় এই ধরনের অভিধান লেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

১০) বিষয়াভিধানে যে কোনও দেশে প্রতিনিয়ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটছে। সেগুলি বিভিন্ন বিষয়কেন্দ্রিক। সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক, পরিবেশগত, আন্তর্জাতিক ইত্যাদি। এগুলিকে সন-তারিখ অনুযায়ী অথবা ঘটনার আদি শব্দ অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনেক। সেগুলি নিয়েই লেখা হয়েছে বিষয়াভিধান।

১১) যুগগত অভিধানে ভাষা ও শব্দ পরিবর্তনশীল রূপে দেখানো হয়েছে। দেখা গেছে এক যুগে কোনও শব্দের অর্থ একরকম ছিল। অন্যযুগে সেই শব্দ আবার ভিন্ন অর্থ বহন করেছে। শব্দ বা শব্দার্থের বাঁক পরিবর্তন বিষয়টা বুঝতে অনেক অভিধান প্রণেতা কোনও সাহিত্যযুগের অভিধান রচনা করেছেন। যেমন প্রাচীন বাংলা ভাষার অভিধান, মধ্যযুগের অভিধান ইত্যাদি।

তিন.

অভিধান পাঠকদের সবচেয়ে বড় অবলম্বন। কারণ অভিধানের মাধ্যমেই পাঠক খুব সহজেই যে কোনও শব্দের সঠিক বানান, স্বচ্ছরূপ, উচ্চারণ প্রণালী, ব্যুৎপত্তি, অর্থ ইত্যাদি জানে। অভিধান যে বিষয়ের উপর লেখা হয়, শব্দ নিতে হয় সেইসব বিষয়কেন্দ্রিক। অন্যথায় ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। সাধারণ অভিধানে বিষয়বস্তু হিসাবে যা থাকবে সেগুলি এইরকম-সঠিক বানান নির্ধারণ। পৃথিবীর কিছু কিছু ভাষায় এই কাজটা করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। কারণ একটি শব্দের একাধিক বানান হলেও অর্থ একই, এইরকম শব্দ প্রচুর আছে। যেমন বাংলা ভাষায় ণত্ব-ষত্ব বিধানের সমস্যা ও একই শব্দকে ভিন্নরূপে উচ্চারণ করার প্রবণতা বানান বিভ্রাটের কারণ। যে সব শব্দের একটা শিষ্ট বানান সমাজে চালু হয়ে গেছে সেখানে সমস্যা কম। কিন্তু যেখানে চালু হয়নি সেখানে কোন বানানটা সঠিক বা যথার্থ তা নির্ধারণ করা খুবই কষ্টকর। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা অকাদেমি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী একই বাংলা শব্দের তিন ধরনের বানান লিখছে। এর থেকেই বোঝা যায় বাংলা শব্দের শুদ্ধ বানান এখনও অনির্ণীত। তাই সকলে একত্রে সিদ্ধান্ত নিয়ে সঠিক, শুদ্ধ বানান নির্ধারণ করে তা অভিধানে প্রণয়ন করা জরুরি। যেমন—

উচ্চারণ রীতি : যে কোনও ভাষার শব্দাবলীর উচ্চারণ প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট অসঙ্গতি আছে। কারণ একই শব্দের বানান বিভিন্ন মানুষের কাছে একাধিকভাবে উচ্চারিত হলে বিষয়টি বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। বিশেষ করে কোনও ভাষার উপভাষার ক্ষেত্রে উচ্চারণগত সমস্যা তো আছেই, এমনকী ভাষার আদর্শরূপে কথা বলা মানুষের ক্ষেত্রেও এটা হয়ে থাকে। যেমন—মেঘ, বেলা, কেবল, দেশ ইত্যাদি শব্দ। এগুলি বিকৃতভাবে উচ্চারিত হয় যথাক্রমে ম্যাঘ, ব্যালা, ক্যাবল, দ্যাশ ইত্যাদি। শব্দাবলীর যথার্থ উচ্চারণ স্থির করা অভিধান প্রণেতার একটি কাজ বটে।

ব্যুৎপত্তি নির্ণয় : যে কোনও অভিধানেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব শব্দাবলীর ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করা। যদিও সাধারণ পাঠক ব্যুৎপত্তি নির্ণয়কে সেরকম গুরুত্ব দেন না, কিন্তু ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের মধ্যে দিয়েই কোনও শব্দের উৎস, চরিত্র ইত্যাদি বোঝা যায়। অভিধান প্রণেতাকে এই ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের বিষয়টি খেয়াল রাখা উচিত।

অর্থ নির্ণয় : অভিধানে যে কোনও শব্দের অর্থ নির্ণয় করা প্রধান কাজ। একজন পাঠক মূলত কোনও শব্দের সঠিক বানান ও শুদ্ধ অর্থ পরখ করার জন্যেই অভিধান দেখে। সে ক্ষেত্রে অর্থের যদি গোলমাল থাকে তবে অভিধান দেখাটাই নিরর্থক হয়ে যায়। কারণ অভিধানে কোনও শব্দের একাধিক অর্থ দেওয়া থাকে। যদি শব্দার্থের রূপ আদি থেকে বর্তমান অবধি ক্রমবিকশিত ভাবে দেওয়া থাকে তবে পাঠকের খুব সুবিধা হয়। এর মাধ্যমে তারা শব্দার্থ পরিবর্তনের রীতিটাও বুঝতে পারে। সুতরাং যে কোনও রচনার মূল বিষয়বস্তু বুঝতে কোনও অসুবিধাই হয় না।

আদর্শ অভিধানে শব্দ যে অর্থদ্যুতিময় তা পরিষ্কার বোঝা যায়। অভিধানে প্রথমে স্থান পায় কোনও শব্দের মুখ্য অর্থ, পরে ভাবগত বা প্রয়োগগত অর্থ ইত্যাদি।

সংজ্ঞা রচনা : যে কোনও শব্দের সংজ্ঞা রচনা করা অভিধানকারের একটি বড় কাজ। কিন্তু এই কাজ থেকে প্রায় সকলেই বিরত থাকে। কারণ শব্দের সংজ্ঞা রচনা করা খুবই কঠিন কাজ। তাই সংজ্ঞা রচনার পরিবর্তে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একাধিক সমার্থক শব্দ বসিয়ে কাজটি সারা হয়। কিন্তু যদি সংজ্ঞা রচনা করা যেত তবে সহজেই এই শব্দের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা অনেক সহজ হয়ে যেত। শুধু তাই নয় এর ফলে অভিধান বিশ্বকোষে রূপান্তরিত হতে পারে।

চার.

বাংলা সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল 'চর্যাপদ' দিয়ে। সেই খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতকে। সেই সময়ই অবশ্য অভিধান রচনার সূত্রপাত লক্ষ করা গেছে। বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দ অমর সিংহের লেখা 'অমরকোষ'-গ্রন্থের 'টীকাসর্বস্ব' রচনা করেছিলেন। এটি লেখা হয়েছিল বাংলা ভাষায়। এখানে অনেক বাংলা শব্দের অর্থ, ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি পাওয়া গেছে। সেই হিসাবে বলা যায় বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান এটি। এরপর দীর্ঘদিন বাংলা অভিধান রচনায় ভাটা পড়ে। অবশেষে বিদেশিদের দ্বারা বাংলা ভাষায় যেমন ব্যাকরণ লেখা হয়েছিল, তেমনি অভিধানেরও সূত্রপাত ঘটেছিল। এ ক্ষেত্রে প্রথম অভিধান প্রণেতা মানোএল দ্য আসুম্পসাউ। তাঁর অভিধানটির নাম ছিল 'ভোকাবুলারি এম ইদিওমা বেনগল্লা, ই পর্তুগিজ দিভিদিদো এম দুয়াস পার্তেস'। এটি ১৭৩৪ সালে সংকলিত হয়। প্রকাশিত হয় দশ বছর পর ১৭৪৩ সালে। এটি ছিল 'বাংলা-পর্তুগিজ' ও 'পর্তুগিজ-বাংলা' অভিধান। এই অভিধান তিনি লিখেছিলেন রোমান বর্ণে। এই সংকলনে স্থান পেয়েছিল নিরক্ষর, দরিদ্র মানুষের ব্যবহৃত শব্দাবলী। এখানে অনেক শব্দ আছে। যেমন—বাদাম, গতর, আলিয়া, আলগোছি ইত্যাদি। যেহেতু এটি বাংলা উপভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত তাই এটিকে বলা যায় বাংলা উপভাষাতত্ত্বের প্রথম গ্রন্থ।

এরপর ১৭৯৩ সালে আপজন প্রকাশিত 'ইঙ্গরাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলরি' প্রকাশিত হয়। এটি 'ইংরেজি-বাংলা' শব্দাবলীর প্রথম অভিধান। এরই কয়েক বছর পরে ও হেনরি প্রিটস ফরস্টার রচনা করেন 'এ ভোকাবোলারি, ইন টু পার্টস, ইংলিশ অ্যান্ড বেংগালি' নামে একটি অভিধান গ্রন্থ। এঁর লেখা 'ইংরেজি-বাংলা' অভিধানটি প্রকাশ পায় ১৭৯৯ সালে ও 'বাংলা-ইংরেজি' অভিধানটি ১৮০২ সালে। এইভাবে প্রথমে বাংলা-পর্তুগিজ, তারপরে ইংরেজি-বাংলা, বাংলা-ইংরেজি ইত্যাদি অভিধান গ্রন্থের মাধ্যমে একটা নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল সেই সময়।

একথা স্বীকার্য বাংলা অভিধান রচনায় প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল বিদেশিরা। পরে আস্তে আস্তে বাঙালিদের মধ্যে অভিধান প্রণয়নের ধারা ছড়িয়ে যায়। প্রথম বাঙালি অভিধানকার ছিলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গ্রন্থাগারিক মোহনপ্রসাদ ঠাকুর। তিনি ১৮১০ সালে তিনি লেখেন 'এ ভোকাবোলারি, বেংগলি অ্যান্ড ইংলিশ, ফর দ্য ইউস অব স্টুডেন্ট'। এরপরের অভিধান রচয়িতা ছিলেন উইলিয়াম কেরি। তাঁর লেখা অভিধানটির নাম 'এ ডিকশনারি অফ দি বেংগলি ল্যাংগুয়েজ ইন হুইচ দ্য ওয়র্ডস অর ট্রেসড টু দেয়ার অরিজিন অ্যান্ড দেয়ার ভেরিয়াস মিনিংস গিভেন'। দু' খণ্ডে সমাপ্ত এই অভিধানটির প্রথম খণ্ড বেরিয়েছিল ১৮১৫ সালে। দ্বিতীয় খণ্ড ১৮২৫। কেরির এই অভিধানটি ছিল খুবই বড় মাপের। তাতে ত্রুটি বিচ্যুতিও ছিল অনেক।

যাই হোক এরপর জি. সি, হটন লেখেন 'এ ডিকসনারি, বেংগলি অ্যান্ড স্যানস্ক্রিট এক্সপ্লেইনড ইন ইংলিশ'। হটন ইংরেজ হয়েও বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার উপর অভিধান লিখেছিলেন। সেই সময় এই অভিধানটি বেশ জনপ্রিয়ও হয়েছিল। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় তিন হাজারের মতো।

এরই মধ্যে অর্থাৎ উনিশ শতকে আরও অনেকে অভিধান লিখেছেন। যেমন—পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ সেন, মার্শম্যান, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ তর্করত্ন, রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ। এইসব অভিধানের বেশিরভাগই আজ অবশ্য পাওয়া যায় না। তবে বিশ শতকে যে সব অভিধান জনমানসে ভীষণভাবে প্রভাব ফেলেছিল তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুবলচন্দ্র মিত্রের 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' (১৯০৫), যোগেশচন্দ্র রায়বিদ্যানিধির 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' (১৯১৩), জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (১৯১৬), হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' (১৯১৬) ও রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' (১৯৩০), শৈলেন্দ্র বিশ্বাসের 'সংসদ বাঙ্গালা অভিধান' (১৯৫৫) ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে আরও কিছু অভিধান রচিত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু 'বাংলা ভাষার অভিধান', 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', 'চলন্তিকা' ও 'সংসদ বাংলা অভিধান'-ই বিখ্যাত। এ কথা স্বীকার্য অর্থ নির্দেশ করাই সব অভিধানের মূল বৈশিষ্ট্য। সেটি কম বেশি সব অভিধানেই আছে। বাংলার প্রায় সব অভিধানই একভাষিক বা দ্বিভাষিক। খুব কম সংখ্যক অভিধানই বহুভাষিক হয়। এখানে প্রথমে থাকে বর্ণনাক্রমিকভাবে মূল শব্দের বানান। তারপরে নির্দেশিত হয় ব্যুৎপত্তি। এবং তারপরে থাকে ওই শব্দটির অর্থবৈচিত্র। কোনও কোনও অভিধানে উচ্চারণরীতির দিকটাও অবশ্য আলোচিত হচ্ছে। যাই হোক এইভাবে বাংলা অভিধান রচনার ধারা বর্তমানে উৎকর্ষতা পেয়েছে। এবং শ্রেণিগতভাবে এসেছে বৈচিত্র।

৪০৫.১.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। অভিধানের স্বরূপ নির্ণয় করে অভিধানের শ্রেণিবিভাগ করো।

২। অভিধান বলতে কী বোঝো? অভিধানের উদ্ভবের বিষয়টি সংক্ষিপ্তরূপে লেখো।

৩। অভিধানের মাধ্যমে পাঠক কীভাবে তার ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পারে তা উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দাও।

৪। অভিধানের সংজ্ঞা দিয়ে বাংলা অভিধানের উদ্ভব ও ইতিহাস বর্ণনা করো।

৪০৫.১.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

২। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে', ২০১৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক-৩

সমাজভাষাবিজ্ঞান

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.১.৩.১ : প্রস্তাবনা

৪০৫.১.৩.২ : সমাজভাষাবিজ্ঞান : এলাকা বা শ্রেণি

৪০৫.১.৩.৩ : বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

৪০৫.১.৩.৪ : সচল বা পরিবর্তনমান সমাজভাষাবিজ্ঞান

৪০৫.১.৩.৫ : প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

৪০৫.১.৩.৬ : উপসংহার

৪০৫.১.৩.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.১.৩.৮ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.১.৩.১ : প্রস্তাবনা

সমাজের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্কের সূত্রে ভাষার সঙ্গেও রয়েছে সমাজের সম্পর্ক গভীর। কেননা ভাষাই মানুষ ও সমাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মুখ্য অবলম্বন। সেই কারণে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচলিত ভাষাগুলি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই। প্রাচীনকালে তাত্ত্বিক আলোচনা না হলেও আধুনিককালে ভাষাকে নিয়ে গবেষকরা তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। অবিভক্ত বাংলায় ভাষা নিয়ে কাজ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'খুলনা জেলার মাঝির ভাষা' নিয়ে গবেষণা করেন। সুকুমার সেন

১৯২৬-এ মেয়েদের মুখের ভাষা নিয়ে রচনা করেন 'নদীর ভাষা'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'The Origin and development of Bengali Language' (1926) গ্রন্থে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করেছেন। পাশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞানী সসিউরও ভাষার সামাজিক দিক নিয়ে গভীর আলোচনা করেছিলেন।

সমাজভাষাবিজ্ঞান অর্থাৎ 'Sociolinguistics' পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেন Haver C. Currier ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। অনেকে আবার সমাজভাষাবিজ্ঞান নামটি পছন্দ করেননি, বরং তারা 'Sociology of Language' কথাটি সমাজভাষাবিজ্ঞানের পরিবর্তে ব্যবহার করার পক্ষপাতী। কিন্তু সমাজভাষাবিজ্ঞান নামটিই বহুল প্রচলিত। অধ্যাপক পবিত্র সরকারের মতে, ১৯৫২ সালের আগে মার্কিন দেশে 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' নামটি বিশেষভাবে ব্যবহার হয়নি। কিন্তু চারের দশকে নানা আঞ্চলিক উপভাষা নিয়ে গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। সাপির, ম্যাকডেভিড, ফার্থ প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী সমাজভাষা বিষয়ক নানা প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে সম্মেলন হয় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। ভাষার তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা না হলেও এখান থেকে সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠে। আসলে সমাজ সংগঠনের সঙ্গে সামাজিক মানুষের ভাষা ব্যবহারের সম্পর্কই হল 'সমাজ ভাষাবিজ্ঞান'। সমাজে ব্যবহৃত প্রায় সব ভাষা, তার বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, সমাজের ভাষাগুলির প্রয়োগ ও বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী সম্পর্কে সামাজিক মানুষের মনোভাব—সমস্ত কিছু সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। ভাষার সঙ্গে সমাজের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা মনে রেখেই ভাষাবিজ্ঞানীরা 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' শব্দটির প্রয়োগ ঘটনা।

সমাজভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা :

এবারে দেখা যাক, সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানীর দেওয়া আলোচনাসমূহ।

Haver C. Curriec 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' বলতে বুঝিয়েছেন সমাজের নানা কাজকর্মের সঙ্গে কথা বলার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার গবেষণা। সমাজের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক স্বীকার করে পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানী স্টার্টেভান্ট সমাজ ভাষার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'Social group'-এর কথা বলেছেন। তাঁর মতে 'Social group' থেকেই ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। হুইটনিও বলেছেন ভাষা হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Language is a social institution) 'sociolinguistics' পরিভাষাটি ঠিকঠাক ব্যবহার করেছিলেন ব্রাইট। তাঁর মতে—

".....linguistics DIVERSITY is precisely
the subject...matter of sociolinguistics"

W. Labour বলেছেন 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' পরিভাষাটি ভাষা ও সমকাজের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে। Hardson 'Sociolinguistics' (১৯৮৫) গ্রন্থে বলেছেন সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক অনুসারে ভাষার অধ্যয়ন হল 'সমাজভাষাবিজ্ঞান'। তিনি ভাষার সমাজতত্ত্ব ও সমাজভাষাবিজ্ঞান-এ দুটিকে আলাদা করতে চাননি। R.T. Bell সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে বুঝেছেন সেই ভাষাবিজ্ঞানকে যেখানে সামাজিক উপায় বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানকে শক্তিশালী করেছে।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী উইলিয়াম লেবভ সমাজভাষাবিজ্ঞান নামটি পছন্দ করেননি। তাঁর মতে ভাষা মাত্রেই সামাজিক। সুতরাং ভাষাতত্ত্ব বা linguistics মানেই তো 'Sociolinguistics' সুতরাং আলাদা করে

'সমাজভাষাবিজ্ঞান' পরিভাষাটি ব্যবহার করা অযৌক্তিক। কিন্তু ফিশম্যান একটিকে আর একটির পরিপূরক মনে করেছেন। তাঁর মতে—

"The sociology of language focusses
upon the entire gamut of topics related
to social organization of language behaviour,
including not only language usuage
per se but also language attitude,
over behaviour language users".

আসলে ফিশম্যান মনে করেন ভাষা সমাজের সঙ্গে যুক্ত, সামাজিক সংগঠনের সঙ্গেই ভাষা সম্পর্কিত। ফিশম্যান ভাষায় সমাজতত্ত্বকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্রাইট অবশ্য 'linguistic diversity' অর্থাৎ 'ভাষাতত্ত্বগত' বিভিন্নতাকে বুঝিয়েছেন।

মনে রাখতে হবে, সমাজের আদিবাসী মানুষদের ভাষা নিয়েই প্রথম সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে গবেষণা শুরু হয়েছিল। কুরিই সর্বপ্রথম 'সমাজভাষাবিজ্ঞান' কথাটি ব্যবহার করেন। তারপর বোয়েস, ম্যাকডেভিড, লেবভ, ফিশম্যান প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানী সমাজভাষাবিজ্ঞান নিয়ে নানা আলোচনা করেছেন। ব্রাইটই প্রথম সমাজভাষাকে তাত্ত্বিকতার দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত সমাজভাষাবিজ্ঞানের সম্মেলনে সমাজভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্র ও পরিধি নির্দেশ করা হয়। উল্লেখ্য, সেখানে সমাজভাষাবিজ্ঞানকে আলাদা একটি ভাষাবিজ্ঞান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪০৫.১.৩.২ : সমাজভাষাবিজ্ঞান : এলাকা বা শ্রেণি

সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উইলিয়াম ব্রাইট ভাষাবৈচিত্র্যের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি সাতটি মাত্রার কথা বলেছেন। আর ফিশম্যান তিনটি মাত্রার কথা বলেছেন। অধ্যাপক পবিত্র সরকার ফিশম্যান ও ব্রাইট-রে দেওয়া ধারণাকে মিলিয়ে একটা নিজস্ব আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। অধ্যাপক মৃণাল নাথ সমাজভাষাবিজ্ঞানকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

ক. অন্যোন্য ক্রিয়াবাচক (Interactional)

খ. পরস্পর সম্বন্ধী (Co-relational)

গ. ভাষা পরিবর্তন ও ভাষা সংযোগ (Language change and contract)

ঘ. ভাষা সমস্যা (Language problem)

অনেক ভাষাবিজ্ঞানী আবার সমাজভাষাবিজ্ঞানকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করতে চেয়েছেন। যেমন—

১. পারস্পরিক কথোপকথনমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

২. পরিমাণবাচক সমাজভাষাবিজ্ঞান

৩. সমাজপ্রতিষ্ঠানমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

৪. ভাষা পরিকল্পনা।

৫. ভাষা লঘু-সম্প্রদায় ও সমাজভাষাবিজ্ঞান

তবে ফিশম্যান সমাজ ভাষাবিজ্ঞানকে যে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন, সেটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই তিনটি ভাগ হল—

১. বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান (Descriptive Sociolinguistics)

২. সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান (Dynamic Sociolinguistics)

৩. প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান (Applied Sociolinguistics)

৪০৫.১.৩.৩ : বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

ভাষার বর্ণনামূলক আলোচনা সমাজভাষাবিজ্ঞানের একটি বর্ণনাত্মক দিক। ব্রাইটের মতে ভাষাবিজ্ঞানের মূল বিষয় হল ভাষাবৈচিত্র্যের বর্ণনা। ব্রাইটের মতো ফিশম্যানও বর্ণনামূলক সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের সাতটি দিক নির্দেশ করেছেন। যথা—

১. বক্তা

২. শ্রোতা

৩. উপলক্ষ্য বা উদ্দেশ্য

৪. ভাষার রূপ

৫. Extent of Diversity

৬. ফিশম্যান এর কোনো নাম দেননি

৭. অবস্থা বা situation

বক্তা:

ভাষার বৈচিত্র্য কেমন হবে, তা নির্ভর করে বক্তার উপর। বক্তা কোথায়, কখন, কিভাবে কথা বলবে তার ওপর নির্ভর করে। তবে এক্ষেত্রে কতগুলি বিষয় বক্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। যথা—সে সমাজের কোন্ স্তরের মানুষ? সে শিক্ষিত না অশিক্ষিত? সে নারী না পুরুষ? তার পেশা কী? সমাজের মানুষদের সঙ্গে তার সম্পর্ক কেমন? তার বয়স কত? এসব নির্ভর করে বক্তার বলার ওপর। তবে সবার আগে বিচার করা দরকার বক্তার সামাজিক পরিচয়টি।

সমাজের স্তরগুলিকে উল্লম্বভাবে ভাগ করলে অনেকগুলি স্তর পাওয়া যায়। যেমন উঁচু তলায় ধনী শিক্ষিত লোকেরা থাকে। আর নীচু তলায় থাকে সমাজের নিরক্ষর গৃহহীন দরিদ্র মানুষেরা। মাঝখানে আর কতগুলি তলা থাকবে তা নির্ভর করে দেশের পরিস্থিতির উপর। আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে সামাজিক মানুষের শ্রেণিভেদ করা হয় এবং সেই শ্রেণি অনুসারে ভাষার বিভিন্নতাও দেখা যায়। তবে শ্রেণিচরিত্র যে সবসময় ভাষা চরিত্র সঠিকভাবে নির্ণয় করবে এমন কথা বলা যায় না। যাই হোক শ্রেণি ও অবস্থানগত দিক বা পরিস্থিতির ওপর

নির্ভর করেই বক্তা ভাষা ব্যবহার করে। যেমন—গ্রাম ও শহরের মানুষের কথাবার্তা-চাল-চলন আলাদা। আবার মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি ছেলে বাড়িতে একরকম কথা বলে, শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে অন্যরকম ভাবে। আবার বন্ধুদের সঙ্গে রকের আড্ডায় কথা বলে, তা সম্পূর্ণ আলাদা রকম। সুতরাং বোঝা যায় এক একটি সামাজিক স্তরে বক্তা এক-এক রকম ভাষা ব্যবহার করে। শুধু তাই নয় উপলক্ষ্য অনুযায়ী বক্তা আবার ভাষা বদলাতে পারে। যে কারণেই বলা হয় বক্তার শ্রেণি পরিচয় ভাষার স্বরূপ নির্ধারণ সম্পূর্ণ করতে পারে না। শ্রেণিবিচার সমাজ-ভাষার অনেকগুলি নির্ণায়কের মধ্যে একটি।

শ্রোতা:

বক্তা যেমন সমাজ-ভাষার বৈচিত্র্য নির্ণয় করে, তেমনি শ্রোতার উপরও সমাজ-ভাষার বৈচিত্র্য নির্ভর করে। তবে শ্রোতাকে আগে বিচার করে নিতে হবে। সামাজিক মানুষের বক্তব্যের রীতি নির্ণয় হয় শ্রোতা অনুযায়ী। যেমন বন্ধুদের সঙ্গে যেভাবে ও যে ভাষায় কথা বলি, গুরুজনদের সঙ্গে নিশ্চয় সেইভাবে হয় না। আবার শিশুদের সঙ্গে কথা বলার সময় আলাদা এক ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়। সুতরাং ভাষার নির্দিষ্ট চরিত্রকে বোঝার জন্য বক্তা যেমন দেখতে হবে, তেমনি যাকে বলা হচ্ছে, তাকেও গুরুত্ব দিতে হবে।

উদ্দেশ্য:

শুধু বক্তা বা শ্রোতা নয়, ভাষার বৈচিত্র্য উদ্দেশ্য বা পরিপ্রেক্ষিতের উপরও নির্ভর করে। বক্তা শ্রোতাকে কি বলবে,তা উদ্দেশ্য বা প্রেক্ষিত অনুযায়ীই আলাদা হবে। যেমন—সভা সমিতির বক্তৃতায় যেমন ভাষা ব্যবহার করা হয়, ঝগড়াতে কিন্তু তেমন ভাষা ব্যবহার করা হয় না। আবার শিক্ষক পড়ানোর সময় যেমন ভাষায় কথা বলে, বাড়িতে সেই ভাষায় বলে না। আবার সংবাদপত্রের ভাষা আর আইনের ব্যাখ্যার ভাষাও এক হয় না। সুতরাং উদ্দেশ্য অনুযায়ী ভাষার বৈচিত্র্য নির্ধারিত হয়। প্রায় সবসময়ই এই রকম হয়ে থাকে।

ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য বিষয়টিকে ডিট্‌মার ভালোভাবে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন—উপভাষা অঞ্চলের জার্মান ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাই জার্মান ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু বাড়িতে নিজেদের উপভাষাতেই কথা বলে। ইংল্যান্ডের ভাষাবিজ্ঞানীরা এই উপলক্ষ্য অনুসারে ভাষা রীতি বদলকে বলেছেন রেজিস্টার। ফিশম্যান মনে করেন ব্যক্তিভেধে ভাষার বদল ঘটে। যেমন—ব্রাসেল্‌সের ডাচ ভাষাভাষী ফ্লেমিশ গোত্রের লোকেরা কিন্তু ডাচ ভাষা ব্যবহার করে না। তারা ফরাসি ভাষা ব্যবহার করে। তাও আবার তিনরকম ফরাসি। যথা—বাজারি ফরাসি, মার্জিত ও সংস্কৃত ফরাসি এবং অফিসের ফরাসি ভাষা। ডাচ ভাষা আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারও করা হয়।

আমাদের বাঙালি সমাজে দুটি ভাষা প্রচলিত আছে। যেমন সাধু ও চলিত এই দুটি ভাষা পাশাপাশি সমানভাবে অনেকদিন ধরে চলেছে কিন্তু সাধু ভাষার সীমাবদ্ধতা থাকার ফলে নানা উপভাষা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন—রাঢ়ী, বঙ্গালী, ঝাড়খণ্ডী, কামরূপী ইত্যাদি। সুতরাং বক্তা কি উপলক্ষ্যে উপভাষা ব্যবহার করবে, সেটাও দেখা দরকার। ইংল্যান্ডের ভাষাবিজ্ঞানীরা 'রেজিস্টার' বলেছেন এই বিষয়টিকে। বিষয়টি এইরকম—বাঙালিরা যখন নিজেদের সঙ্গে কথা বলে, তখন বাংলায় বলে। কিন্তু অফিসে গিয়ে হিন্দি ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে হিন্দি ভাষায় কথা বলে,

আবার ইংরেজি ভাষাভাষী মানুষদের সঙ্গে ইংরেজি ভাষায়। আবার ধর্মস্থানে হিন্দুরা সংস্কৃত, মুসলিমরা আরবি ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করে। সুতরাং বক্তার উপলক্ষ্য সমাজভাষাবিজ্ঞানের আদর্শ বক্তব্য।

মার্কিন ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষাবৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে উপলক্ষ্যকে গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাষাবিজ্ঞানী উইলয়ম লেভবও দেখিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন স্তরে জীবিকা, শিক্ষা ইত্যাদির কারণে ভাষা নানারকম হয়ে পড়ে। অনেকেই মনে করেছেন উপভাষা যেমন ভাষার পার্থক্য সৃষ্টি করে, তেমনি পুরুষ ও নারী ভেদে ভাষা কিছুটা আলাদা হয়ে যায়। যেমন—বাংলা ভাষা ও উপভাষায় মেয়েরা দৈনন্দিন জীবনে যেভাবে কথাবার্তা বলে, তা পুরুষদের থেকে কিছুটা আলাদা। বাংলা ভাষায় এই মেয়েলি কথ্যরীতিকে সুকুমার সেন বলেছেন 'women's dialect' বা 'মেয়েলি উপভাষা'।

ভাষার রূপ :

সমাজের বিভিন্ন স্তরে ভাষা বিভিন্ন হয়। সমাজের স্তরগুলিকে বহুতল বাড়ির সহেগ তুলনা করা হয়। সবচেয়ে উঁচু স্তরে থাকে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ও বিত্তশালী লোক। আর নীচের তলায় থাকে নিরক্ষর। দরিদ্র মানুষের দল। এই দুই স্তরের ভাষার রূপের মধ্যে পার্থক্য আছে। আসলে আর্থিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত শ্রেণির কারণে ভাষার রূপের বদল ঘটে। মান্য ভাষা বা উচ্চ ভাষা সবসময়ই ুপরের স্তরে থাকে। শিক্ষিত লোকজন অনেক সময় বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মিশিয়ে বলে। সমাজের নীচের স্তরের অশিক্ষিত মানুষরা কিন্তু তা পারে না। আবার সব উচ্চশিক্ষিত লোকেদের ভাষা একরকম নয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী উচ্চশিক্ষিত মানুষের ভাষার মধ্যেও বিভাজন রয়েছে। তাই উচ্চশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও যে ভাষার বৈচিত্র্য রয়েছে তাকে খুঁজে বের করা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের কাজ।

Extent of Diversity :

সমাজ-নির্দিষ্ট ভাষাবৈচিত্র্যের পরিমাণ ও প্রকারের নাম ব্রাইট দিয়েছেন Extent of Diversity। যেমন—কলকাতায় যারা বাস করে তাদের ভাষা এক রকম। আবার কাজের সূত্রে যারা কিছুদিনের জন্য শহরে থাকে, তাদের ভাষা আলাদা। সুতরাং এক জায়গায় বসবাস করলেও ভাষার বিভিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে। আর বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের কাজ ভাষায় এই বিভিন্নতা খুঁজে বার করা।

ফিশম্যান এর কোনো নাম দেননি :

ফিশম্যান বলেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় দুটি ভাষাসংযোগের ফলে একটি মিশ্র ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, যার নাম 'পিজিন'। কথাটির উদ্ভব ইংরেজি 'Business' থেকে। যার বাংলা অর্থ ব্যবসা। চিনা ভাষায় 'পিজিন' কথাটি বেশি ব্যবহৃত হয়। পিজিনকে যোগাযোগের ভাষা বলা হয়। 'পিজিন' থেকেই বিকৃত ইংরেজি একটি ভাষা এসেছে, সেটি হল 'পিপিন ইংলিশ'। 'পিজিন' ভাষাটি মূলত দ্বিতীয় ভাষা বা L_2 হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মনে রাখতে হবে, সারা পৃথিবীতে ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রগুলিতেই বেশি 'পিজিন' ভাষা গড়ে উঠেছে। তবে মাতৃভাষা হিসেবে কিন্তু 'পিজিন' ভাষা সাধারণত ব্যবহৃত হয় না। এর এলাকাও সীমিত। আর ভাষাটির শব্দভাণ্ডারও সীমিত। এই ভাষার

ব্যাকরণ অত্যন্ত সরল। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে অল্প কথাবার্তার কারণে 'পিজিন' ভাষাটির সৃষ্টি হয়েছে। তবে একাধিক ভাষাগোষ্ঠীর মিলনে যে 'পিজিন' ভাষা গড়ে ওঠে, তা স্থানীয় ভাষার একটি নীচের স্তর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

একই ভাষা সম্প্রদায়ের লোক কিন্তু কখনও নিজেদের মধ্যে 'পিজিন' ভাষায় কথা বলে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উৎস থেকেই অধিকাংশ 'পিজিন' ভাষা তৈরি হয়েছে, এইরকম অনুমান করা যেতেই পারে।

আসলে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিভিন্ন ভাষার লোকেরা এক জায়গায় জড়ো হয়। ফলেতারা ভাষায় কথা বলতে শুরু করে। মূলত দ্বিতীয় ভাষাও একটা উদ্দেশ্য নিয়েই ব্যবহৃত হয়। এই মিশ্র ভাষাটি নিয়ে কাজ করাও সমাজভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। মনে রাখতে হবে, চিনাদের মুখে সর্বপ্রথম এই মিশ্র ভাষা অর্থাৎ 'পিজিন' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। সারা পৃথিবীতে নানা সময়ে একাধিক 'পিজিন' ভাষার জন্ম হয়েছে বাণিজ্যের প্রয়োজনে। নিজেদের ভাষা ছেড়ে দিয়ে সিঙ্গাপুর, হংকং, সাংহাই ইত্যাদি বন্দরে চিনাদের মুখে 'পিজিন' ভাষায় পরিণত হয়েছে ইংরেজি ভাষাটি। পশ্চিম আফ্রিকা, জার্মানির তুর্কি শ্রমিকরাও 'পিজিন' ভাষা তৈরি করেছে। 'ক্রেয়োল' ভাষাটি হল 'পিজিন' ভাষার পরবর্তী ধাপ। 'পিজিন' ভাষাটি কোনো ভাষা ভাষীর গোষ্ঠীর মাতৃভাষা রূপে স্বীকৃত হলে, তবে তাকে 'ক্রোয়েল' বলা হয়। 'পিজিন'কে পূর্ণ ভাষা হিসেবে ধরা না হলেও 'ক্রেয়োল'কে ধরা হয়। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মরিশাসের অধিবাসীরা 'ক্রোয়োল' ভাষায় কথা বলে।

অবস্থা বা Situation :

বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 'অবস্থা' বা 'Situation' ব্যাপারটি অধিকতর তাত্ত্বিক গুরুত্ব লাভ করেছে। আসলে একটি ব্যক্তি কেবলমাত্র একটিই অবিমিশ্র ভাষা আয়ত্ত করে না—সে একাধিক ভাষা বলতে পারে। যেমন একজন মানুষ বাড়িতে যে ভাষায় কথা বলে, চাকরি সূত্রে অন্য জায়গায় গিয়ে আরেকরকম ভাষা বলে। ফলে দীর্ঘদিন এভাবে পরিবর্তিত ভাষাটি ব্যবহার করতে করতে সে প্রথম ভাষাটি—প্রায় ভুলে যায়। ফিশম্যানের মতে, Situation অনুযায়ী মানুষ আগের ভাষা ভুলে নতুন ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান Situation অনুযায়ী ভাষার পরিবর্তনের বৈচিত্র্য আলোচনা করে।

এখনকার ভাষাবিজ্ঞানীরা ধরেই নিয়েছেন যে একটি ব্যক্তি একটি ভাষা ব্যবহার করে না। সে একই ভাষা ব্যবহার করলেও সেই ভাষার একাধিক রীতি, উপভাষা, সমাজভাষা ব্যবহার করে। আসলে বাড়িতে সেই ব্যক্তিই যে ভাষায় কথা বলে, বাইরে গেলে সেই ভাষায় কথা বলে না। ফিশম্যান বলেছেন ভারতবর্ষ বহুভাষী দেশ। তাই Situation অনুযায়ী ভাষার বদল হয়। শুধু ভাষা নয় এমনকী ভাষারীতিও বদলে যায় অনেকক্ষেত্রে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ব্রাসেলসের ডাচ ভাষী মানুষরা নিজেদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় ডাচ ভাষা ব্যবহার করলেও চাকরি সূত্রে বা অন্য অনেক কারণে ডাচ ভাষার পরিবর্তে ফরাসি ভাষা ব্যবহার করে। আবার নানা উপভাষাও তারা ব্যবহার করে। সুতরাং এই উপভাষা ব্যবহারের বিষয়টি পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল।

আমরা জানি, সমাজের সবথেকে ওপরে বিত্তশালী লোক থাকে। নীচে থাকে দরিদ্র মানুষের দল। অবস্থাগত এই বৈচিত্র্য উভয়শ্রেণির লোকদের ভাষাকে পৃথক করেছে। কারণ উচ্চশ্রেণির লোকেরা শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে বা অর্থনৈতিক দিকে থকেও এগিয়ে আছে। কিন্তু নীচু শ্রেণির লোকেরা শিক্ষা-দীক্ষা বা অর্থের দিকে পিছিয়ে

আছে। সুতরাং যে ভাষায় উঁচু শ্রেণির লোকেরা কথা বলেতা নীচের স্তরের লোকেরা ব্যবহার করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে বিশেষ factor হয়ে দাঁড়িয়েছে Situation বা অবস্থাগত পার্থক্য। কারণ একজন শিক্ষিত লোক মান্যভাষায় কথা বললেও গুণ্ডা কিন্তু সেই ভাষায় কথা বলে না। এখানে তো Situation-ই কাজ করে। আর বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের কাজ Situation অনুযায়ী ভাষার এই পরিবর্তনকে আলোচনা করা।

৪০৫.১.৩.৪ : সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান

ফিশম্যান সমাজভাষাবিজ্ঞানের যে দ্বিতীয় ভাগটির কতা বলেছেন তা হল সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান। সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞানে সমাজ ভাষার উদ্ভব, বিবর্তন, বিস্তার, সংকোচনের ধারাক্রমের দিক ইত্যাদি আলোচনা করা হয়। ভাষাবিজ্ঞানী উইলিয়াম লেভবও সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞান নিয়ে সবথেকে বেশি আলোচনা করেছেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি দ্বীপের মানুষদের নিয়ে এ ব্যাপারে গবেষণা করেন। এখানে দেখা যায় অল্প ও বেশি বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাষার পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। আবার ভিন্ন ভাষাভাষী কিছু মানুষের কাছে এই দ্বীপের বাষা ব্যবহারের পরিবর্তনটা আরও বড় ভাবে ধরা পড়ছে। কেননা, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষদের ভাষা আয়ত্ত করতে চাইলেবেশি বয়স্করা প্রাচীন রীতিতে বিশ্বাসী হওয়ায় তা আয়ত্ত না করেই থাকে। তারা সংস্কৃতির গর্ব ও ভাষার স্থানীয় উচ্চারণরীতিকেই ধরে রেখেছে। কিন্তু অল্প বয়সীরা মিশ্র ভাষায় কথা বললে সাধারণ মানুষের একটি দল বিরাট সমস্যায় পড়ল। তারা কোন্ ভাষা ব্যবহার করবে তা বুঝে উঠতে পারল না। এই যে ভাষার পরিবর্তনশীলতা, তাকে লেবভ বলেছেন— 'Dynamic Sociolinguistics'।

শুধু এটা নয়, একটা ভাষার জনগোষ্ঠী যখন অন্য বাষার দেশে কাজ করতে যায়, তখন সে সেখানে বসবাস করার দরুন ভাষার বদল ঘটায়। ফলে সেক্ষেত্রে দ্বিভাষিকতাকে ফিশম্যান দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

১. স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা।

২. অস্থির দ্বিভাষিকতা।

স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা ও অস্থির দ্বিভাষিকতার মধ্যে পার্থক্যকে ফিশম্যান ভালোভাবে দেখিয়েছেন। জীবনের নানা ক্ষেত্রে এই দুটি দ্বিভাষিকতাই ব্যবহৃত হয়। তবে ক্লস দ্বিভাষিকতাকে অন্য দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

১. অন্তদ্বিভাষিকতা।

২. বহিঃর্দ্বিভাষিকতা।

ফিশম্যানের মতে অনেক মানুষ কাজের সূত্রে কোনো জায়গায় গেলে গোষ্ঠীর সূত্রে দুটি করে ভাষাই বলতে থাকে। নিজের ভাষাভাষী লোকের সঙ্গে নিজের ভাষার কথা বলে। আবার নতুন সমাজের লোকের সঙ্গে অন্য ভাষায় বলে। এভাবে তারা দুটি ভাষাকেই পাশাপাশি রাখে। ফিশম্যান একেই বলেছেন স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা। কিন্তু ব্যক্তি গোষ্ঠীবদ্ধ না হয়ে যদি অল্প কয়েকজনের সঙ্গে কোনো জায়গায় যায়, তাহলে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সেখানকার ভাষাতেই কথা বলে। ফলে নিজের মাতৃভাষা ব্যক্তি হারিয়ে ফেলে। এটিকে ফিশম্যান অস্থির দ্বিভাষিকতা বলেছেন।

দ্বিভাষিকতাকে ফিশম্যান 'Situation' বা 'code switching'-এর এলাকাভুক্ত বলে মনে করেছেন। আসলে এক ভাষাবৈচিত্র্য থেকে অন্য ভাষাবৈচিত্র্য অবস্থা অনুসারে ও প্রয়োজন অনুসারে ঘটে থাকে। বহুভাষিক দেশে ব্যাপারটি প্রায়ই ঘটে থাকে। সমাজভাষাবিজ্ঞানীরাও মনে করেন একজন মানুষ একাধিক ভাষা ব্যবহার করে। আবার যদি একাধিক উপভাষা কোনো ব্যক্তি ব্যবহার করে, তবে সে দ্বি-উপসর্গ ব্যবহার করে। যেমন—ইটভাটার কর্মরত সাঁওতালরা নিজেদের মধ্যে সাঁওতালি ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু বাংলা ভাষাভাষী লোকের সঙ্গে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। সুতরাং এক্ষেত্রে দ্বিভাষিকতার ব্যবহার এসেই যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে আমরা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখি। তাই ভাষার সংরক্ষণ বা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াস সম্পর্কে আলোচনা করাও সচল বা পরিবর্তমান সমাজভাষাবিজ্ঞানের কাজ। যেমন আগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাধুভাষা ব্যবহৃত হত। কিন্তু ক্রমে সাধুভাষার ব্যবহার কমে আসতে থাকে। আবার পাণিনির সংস্কৃত ভাষাও মৃত ভাষায় পরিণত হয়েছে। এগুলি আলোচনা করা পরিবর্তনশীল সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের কাজ।

মনে রাখতে হবে একভাষী দেশে অস্থির দ্বিভাষিকতা যতটা সহজভাবে পাওয়া যায়, বহুভা,ী দেশে তেমনি স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন—ভারতবর্ষ বহুভাষী দেশ। এখানে ইংরেজি শিক্ষিত মানুষরা বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষাই ব্যবহার করে। সুতরাং এক্ষেত্রে শিক্ষিতদের মধ্যে মাতৃভাষাও ইংরেজির একটা স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা মোটামুটি বজায় আছে। কারণ ইংরেজি আর বাংলার প্রয়োগ বা function-এর ক্ষেত্র সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। আবার অনেক জায়গায় ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে রক্ষণশীলতা দেখা যায়। যেমন—চিনারা অত্যন্ত রক্ষণশীল। তাই তারা তাদের ভাষাকে টিকিয়ে রেখেছে। চায়না টাউন, সানফ্রান্সিসকো, লস এঞ্জেলস ইত্যাদি স্থানে গেলে ভাষায় এই রক্ষণশীলতা দারুণভাবে বোঝা যায়। সুতরাং ভাষার ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত অনুকরণ, নিজেদের সমাজ সংস্কৃতি ও ভাষার প্রতি মমত্ব ও গর্ববোধের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন চলে এবং তার ফলে ভাষার যে যে পরিবর্তন সাধিত হয় লেবভ তাও দেখিয়েছেন। এই সবই সচল সমাজভাষাবিজ্ঞানের কাজ।

বহুভাষী দেশে স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা আছে সত্যি, কিন্তু দুটি ভাষার মধ্যে একটির স্থানচ্যুতির সম্ভাবনা আছে। যেমন—শিক্ষিতরা মাতৃভাষা ও ইংরেজির মধ্যে একটা স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতা বজায় রাখলেও ইংরেজির স্থানচ্যুতির সম্ভাবনা এখানেও ক্রমশ বাড়ছে। যেমন—ইথিয়োপিয়াতে 'অ্যামহারিক ভাষা' ক্রমশ ইংরেজি ভাষাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। কানাডাতে একসময় ইংরেজি ও ফরাসি এই দুই ভাষার মধ্যে স্থিতিশীল দ্বিভাষিকতার ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ফরাসিরা নিজ ভাষাতেই কাজের সুযোগ পাচ্ছে বলে ইংরেজি ভাষাকে ক্রমশ তারা বর্জন করার চেষ্টা করছে। ফলে সেখানে আবার একভাষিকতার সৃষ্টি হয়েছে ফ্রান্সের কুইবেক অঞ্চলে। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে দ্বিভাষিকতা থাকছে না।

৪০৫.১.৩.৫ : প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে তৃতীয় বিষয়টি হল প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান। ব্রাইট এর নাম দিয়েছিলেন 'Application'। কিন্তু ফিশম্যান 'Application' বলতে পরিকল্পিত প্রয়োগ বোঝেন। সামাজিক কল্যাণ এই

প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে। যেমন মাতৃভাষা শেখানোর পদ্ধতির সংশোধন এবং উন্নয়ন, অন্যান্য ভাষাশিক্ষার নীতি, অনুবাদের নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের কাজ। আসলে কোনো সাহিত্যের নান্দনিক আনন্দকে বুঝতে গেলে অনুবাদের দ্বারা সম্ভব হয় না। সেই ভাষার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য আগে জানা দরকার। তাই অনুবাদের ক্ষেত্রে এই নীতির ব্যাখ্যা খুবই জরুরী, যেটি করে প্রয়োগমূলক ভাষা বিজ্ঞান। ভাষার পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করাও প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের বিষয়। উইলিয়াম কেরিকে আমরা বাংলা গাদ্যের জনক হিসেবে জানি। আবার বিদ্যাসাগরকেও বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। সুতরাং বিদ্যাসাগর বা কেরির হাতে বাংলা ভাষার যে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন হয়েছে তাও এই ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়।

প্রয়োগমূলক ভাষাবিজ্ঞানের আরও একটি কাজ হল বিষয় অনুযায়ী ভাষার পর্যায় নির্ধারণ। যেমন-পত্রিকায় বিভিন্ন ভাষায় লেখা হয় এক একটি বিষয়ের জন্য এক এক রকমের ভাষারীতি ব্যবহার করা হয়। 'ভাষা ও সমাজ' গ্রন্থে মৃণাল নাথ বিষয়টির সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন—

১. আপনার যত্রণার উপশমের জন্য একটি বড়ি লিখে দিচ্ছি।

২. খানিক পর কড়ায় আলু ও টমোটো ছেড়ে দিন। কষতে থাকুন। বেশি খানিক কষা হলে কড়ায় অল্প জল ঢেলে দিন। সঙ্গে দিন সামান্য নুন ও মিষ্টি।

সুতরাং এখানে বোঝা যায় প্রথমটি চিকিৎসা ব্যাপারে ব্যবহার করা ভাষা, আর দ্বিতীয়টি রান্নার জন্য ব্যবহৃত ভাষা।

উপরের কাজগুলি ছাড়াও প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান আরও কতগুলি কাজ করে। যেমন—বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষায় ব্যবহৃত মিডিয়াম নিয়ে আলোচনা করে এই ভাষাবিজ্ঞান। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানে এই বিষয়টিকে বিরাট গুরুত্ব দিয়ে কতগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যেমন—

১. বানান সংস্কার।

২. লেখ্য প্রণালীর উদ্ভাবন বা ভাষার স্টাইল সৃষ্টি করা।

৩. ভাষা পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দান ও জাতীয় ভাষা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি।

এমনকি ১৯৫৬ সালে ভারতবর্ষে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশের সীমারেখার বিন্যাসও প্রয়োগমূলক সমাজ ভাষাবিজ্ঞানের কাজ। ভারতবর্ষ, সোভিয়েত ইত্যাদি কয়েকটি দেশে শাসনতান্ত্রিক পর্যায়ে মেজর ও মাইনর ভাষার সম্পর্কে কেমন হবে, তাও নির্ধারণ করে প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান। এখন এই কাজের ক্ষেত্রটিকে বলা হয় 'Language planning'।

আসলে ব্রাইট ও ফিশম্যানের আলোচনায় কিছু বক্তব্যে মিল ও কিছু বক্তব্যে অমিল আছে। কোনো ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে ব্রাইট সেই ভাষার মানুষদের জাতিভেদ, শ্রেণিভেদ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের কথা বলেছেন। একে ব্রাইট নাম দিয়েছেন 'diognatic' প্রয়োগ।

বলাবাহুল্য বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের মধ্য প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে এসে যাচ্ছে। আসলে ফিশম্যান তাত্ত্বিকভাবে ভাষাবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগ করলে, বাস্তবক্ষেত্রে সবসময় তা মানা যায় না। তাই বর্ণনামূলক ও প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রে এক হয়ে গেছে।

সুতরাং আলোচনার শেষে দেখা যাচ্ছে সমাজের ভিতরে যে সব স্তর আছে তাদের ভাষারীতি আলাদা, ভাষা অভ্যাসও আলাদা। এই পার্থক্য বক্তা, শ্রোতা, উপলক্ষ্য বা পরিস্থিতি অনুসারে আলাদা হয়। উচ্চ ও নীচ সমাজের ভাষা আলাদা। বিত্ত, জীবিকা, শিক্ষা ইত্যাদির প্রভাবে মান্য শিষ্ট ভাষাও কিছুটা পরিবর্তিত হয়। ফলে মান্যভাষার একাধিক রূপও ব্যবহার হতে থাকে সমাজের মধ্যে। আর্থিক উন্নতির সূত্র ধরে সমাজের মধ্যে বাস করা মানুষদের মধ্যে পার্থক্য বা হয় এবং বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি হয়। সেই স্তরে ভাষা অভ্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন গোষ্ঠীগত বা স্থানগতভাবে হলে তাকে বলে সমান্তরাল ভাষিক পরিবর্তন। যেমন গ্রাম আর শহরের ভাষার মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই লক্ষণীয়। আবার বাড়ির ভাষা থেকে শহরে এসে আর একরকম ভাষার সৃষ্টি হয়। ব্লুমফিল্ড ভাষার এই স্তরকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। যথা—

১. সাহিত্যিক আদর্শ।
২. আদর্শ চালিত।
৩. প্রাদেশিক আদর্শ।
৪. আদর্শের ভাষা।
৫. স্থানীয় উপভাষা।

সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগুলি ব্যবহৃত হয়।

৪০৫.১.৩.৬ : উপসংহার

বলা বাহুল্য, ভাষার অভ্যাস প্রথম অর্জিত হয় মাতৃক্রোড়ে, নিজের পরিবারে, নিজের গ্রামে ও সামাজিক মানুষদের কাছ থেকে। তারপর বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের কাছ থেকেও তারা ভাষা শেখে। গ্রামের মানুষরা মূলত মান্যভাষাটি শিক্ষার মধ্যে দিয়েই আয়ত্ত করে। তবে সামাজিক অবস্থান সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে ভাষার ওপর। সুতরাং আমাদের দেশের ভাষা পরিস্থিতির সঙ্গে সমাজভাষাবিজ্ঞানের যোগ নিবিড় একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪০৫.১.৩.৭ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। সমাজভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝো? সমাজভাষাবিজ্ঞানের এলাকা নির্বাচন করে সচল সমাজভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখো।
২। বর্ণনামূলক সমাজভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়ে বিষয়টি আলোচনা করো।
৩। সমাজভাষাবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও শ্রেণি নির্বাচন করে প্রয়োগমূলক সমাজভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দাও।
৪। সমাজভাষাবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাজন করে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখো।

৪০৫.১.৩.৮ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' (১৪০৩)—ড. রামেশ্বর শ্, পুস্তক বিপণি

২। 'আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' (১৯৯৭)—আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, নয়া উদ্যোগ

৩। 'ভাষা দেশ-কাল' (২০০০)—পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ

৪। 'ভাষাবিদ্যা পরিচয়' (২০০২)—অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দুর্গা লাইব্রেরি

৫। 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা' (২০০৪)—অনিমেষকান্তি পাল, বামা পুস্তকালয়

৬। 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, সুখেন বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং

৭। 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, সুখেন বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং

৮। 'ভাষাবিজ্ঞান :তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ' (২০২২), সুখেন বিশ্বাস, দে'জ পাবলিশিং

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ১

একক-৪

মনোভাষাবিজ্ঞান

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.১.৪.১ : প্রস্তাবনা

৪০৫.১.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.১.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.১.৪.১ : প্রস্তাবনা

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হল ভাষা। তাই মানুষের মনের সঙ্গে ভাষার একটি নিবিড় সংযোগ রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে মনস্তত্ত্ব বা মনোবিজ্ঞান যুক্ত হয়ে ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখা তৈরি হয়েছে তাকে বলা হয় মনোভাষাবিজ্ঞান। এটি ভাষাবিজ্ঞানের একটি বহিরাঙ্গিক দিক। অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব ইত্যাদি ভাষাবিজ্ঞানের অন্তরঙ্গ বিষয়। এদের বাইরে ভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে মনস্তত্ত্ব যুক্ত হয়ে মনোভাষাবিজ্ঞান তৈরি হয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানের এই শাখায় মানুষের মন ও তার ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করা হয়। কিন্তু মনোভাষাবিজ্ঞানকে আংশিকভাবে ভাষাতত্ত্ব এবং আংশিকভাবে মনোবিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। কারণ, মানব মনস্তত্ত্ব নিয়ে তৈরি এটি একটি জটিল বিজ্ঞান যা ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখাকে নির্দেশ করে। গবেষণার বিষয়ে মনোভাষাবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞানের কাছাকাছি এবং গবেষণা পদ্ধতিতে এটি মনোবিজ্ঞানের কাছাকাছি। স্বাভাবিকভাবেই মনে বিভিন্ন প্রশ্ন জাগে তাহলে মনোভাষাবিজ্ঞান কী? এর স্বরূপ কেমন? এর বৈশিষ্ট্যই বা কী?

এক.

মনোভাষাবিজ্ঞান সাধারণত এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে। যেমন—

ক) শিশুরা কীভাবে ভাষা আয়ত্ত করে? তাদের ভাষা অর্জন বা Language Acquisition করার পদ্ধতিগুলো কী কী?

খ) শিশুরা কীভাবে ভাষা বুঝতে পারে? তাদের ভাষা উপলব্ধি বা Language Comprehension করার কৌশলগুলি কী কী?

গ) শিশুরা কীভাবে ভাষা উৎপাদন করে? তাদের Language Production বা Speech Production কীভাবে হয়?

ঘ) শিশুরা কীভাবে তাদের মাতৃভাষায় (Mother Tongue-First Language Learning) শিক্ষা লাভ করে?

ঙ) মাতৃভাষার পাশাপাশি শিশুরা কীভাবে অন্য একটি ভাষা অর্জন (Second Language acquisition) করতে পারে?

ভাষা অর্জনের ক্ষেত্রে দুটি প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত আছে। যথা আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহজাত দৃষ্টিভঙ্গি। আচরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশু তার আচরণের মাধ্যমে ভাষা অর্জন করে থাকে। অন্যদিকে, সহজাত দৃষ্টিভঙ্গিতে শিশু তার অন্তর্নিহিত বিমূর্ত পদ্ধতির মাধ্যমে ভাষা অর্জন করে থাকে।

যে পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে নিজের ভাষা অপরকে বোঝানো সম্ভব এবং নিজে বোঝা সম্ভব তাকে বলা হয় ভাষা উপলব্ধি বা Language Comprehension।

যে পদ্ধতিতে মানুষ লেখ্য বা কথ্য আকারে ভাষা প্রয়োগ করে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে সক্ষম হয় তাকে বলা হয় ভাষা উৎপাদন। প্রথম ভাষা অর্জন ও দ্বিতীয় ভাষা অর্জন মনোভাষাবিজ্ঞানের দুটি প্রধান দিক হল প্রথম ভাষা অর্জন এবং দ্বিতীয় ভাষা অর্জন। যে প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে মানুষ তাদের মাতৃভাষা অর্জন করে তাকে বলা হয় প্রথম ভাষা অর্জন। অপর দিকে প্রথম ভাষা অর্জন করার পরে ওই জ্ঞানের উপরে ভিত্তি করে অপর একটি ভাষা শিখলে তাকে বলা হয় দ্বিতীয় ভাষা অর্জন। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রথম ভাষা অর্জনের চেয়ে দ্বিতীয় ভাষা অর্জন করা অনেক বেশি কঠিন। কিন্তু মজার বিষয় হল শিশুদের ক্ষেত্রে এই কথা প্রযোজ্য নয়। শিশুরা সহজেই একাধিক স্থানীয় ভাষা শিখতে সক্ষম হয়।

দুই.

মূলত চমস্কির গবেষণার ফলেই মনোভাষাবিজ্ঞান শাখাটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। তিনি তাঁর 'Generative Grammar'-এ মানুষের মন-ভাষা ও তার গঠনকে বিশ্লেষণ করার কথা বলেছিলেন। এটাকে তিনি মনোবিদ্যার শাখা হিসেবে অনুভব করেছিলেন। তাঁর আগের ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ড ভাষার যান্ত্রিক দিককেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি কখনওই অনুভব করেননি, ভাষা মানবমনের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ বা মনের একটি ক্রিয়া। চমস্কি এসবের পাশাপাশি পারঙ্গমতাবোধ (Competence)-এর কথাও বলেন। কারণ মানুষ সবসময় ব্যাকরণের নিয়মকানুন মেনে কথা বলে না। এই যে ব্যাকরণগত বিচ্যুতি এটার সঙ্গে মনস্তত্ত্বের যোগ রয়েছে। চমস্কি এক্ষেত্রে স্বজ্ঞা (Intuition)-কেও গুরুত্ব দিয়েছেন। স্মৃতির অপার ক্ষমতার কথা স্বীকার করেছেন তিনি। কারণ স্মৃতির মধ্যেই ভাষা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ও ব্যাকরণগত সূত্র জমা থাকে। গবেষকরা বলেন, চমস্কিকথিত পারঙ্গমতাবোধ (Performance)-এর সঙ্গে সংবর্তনের যোগ রয়েছে। বাক্যিক ও শব্দার্থতত্ত্বগত যে কক্ষগুলি আছে চমস্কির ব্যাকরণে তার কথাও বলেন তাঁরা।

চমস্কি ১৯৬৫ সালে 'Aspect of the Theory of Syntax' লেখেন। সেখানেই তিনি স্বজ্ঞা (Intuition)-এ অবস্থিত ধারণাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন, এর পরেই মনোভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা এগিয়ে যেতে থাকে।

তিন.

ভাষা শেখা খুব সহজ কাজ নয়। ভাষাগত বিভিন্ন উপাদান রয়েছে যাদের সঠিক ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা করা হয়ে থাকে। এই জটিল প্রক্রিয়ার জন্য দক্ষতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু শিশু খুব সহজেই তা আয়ত্ত করতে পারে। কীভাবে মানবশিশু এই কাজটি করে?

ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, শিশুর ভাষা শেখার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান তার মধ্যেই নিহিত থাকে। জিনগতভাবে শিশুরা এই ক্ষমতা পায়। তার সঙ্গে যুক্ত হয় পরিবেশ পরিস্থিতি। মানব মস্তিষ্কের মধ্যে শিশুর ভাষাসংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদান রয়েছে যার দ্বারা শিশু এই ক্ষমতা অর্জন করে। কারণ মাতৃগর্ভে থাকাকালীন অর্থাৎ জন্মের আগে থেকেই শিশুদের মস্তিষ্ক ভাষা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আর জন্মের পর থেকে সরাসরি ভাষার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে। তখন তাদের মস্তিষ্ক থাকে পরিষ্কার শ্লেটের মতো, যাকে দার্শনিক ও মনোবিদ জন লক বলেছিলেন 'টাবুলা রাসা'। এই পরিষ্কার শ্লেটের মতো মস্তিষ্কে জন্মের পর থেকে দাগ পড়তে থাকে। এই ভাবেই ভাষা শিক্ষা শুরু হয়। মনোভাষাবিজ্ঞানে শিশুর ভাষা শেখার বিভিন্ন স্তর ও পদ্ধতি আলোচনা করা হয়। মানব-মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ মানুষকে কথা বলতে সাহায্য করে। যেমন—ব্রোকাস এরিয়া, ভোরনিক এরিয়া, হেসলেস জাইরাম, বিভিন্ন ধরনের স্নায়ু ও স্নায়ুতন্ত্রের অংশ। মস্তিষ্কের এই অংশগুলি মানুষকে ভাষা শিখতে, কথা বলতে, ভাষা বুঝতে এবং মৌখিক ও লিখিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে সাহায্য করে।

মনোভাষাবিজ্ঞান বা ভাষার মনোবিজ্ঞান হল ভাষা ও মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অধ্যয়ন। মন ও মস্তিষ্ক একে অন্যের উপরে নির্ভরশীল। মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন দিক মানুষকে ভাষা অর্জন করতে, ব্যবহার করতে, বুঝতে এবং তৈরি করতে সাহায্য করে। মনোভাষাবিজ্ঞানে দেখানো হয় কীভাবে মানুষের মস্তিষ্ক ও মানুষের মন পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে ভাষাকে প্রভাবিত করে। প্রধান ক্ষেত্রগুলি অনুসারে লোকেরা কীভাবে ভাষা অর্জন ও ব্যবহার করে মনোভাষাবিদরা তা অধ্যয়ন করে। যেমন—

ভাষা বোঝা : মানুষ কীভাবে ভাষা বুঝতে পারে?

ভাষা উৎপাদন : মানুষ কীভাবে ভাষা তৈরি করে?

দ্বিতীয় ভাষা অর্জন : যারা ইতিমধ্যে একটি ভাষা জানে তারা কীভাবে অন্য ভাষা অর্জন করবে?

এখানে মনোভাষাবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন করা যাবে—

ক) মনোভাষাবিজ্ঞান হল ভাষার মনোবিজ্ঞান যেখানে মানুষের ভাষাগত কারণ ও মনস্তত্ত্বিক দিকগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অধ্যয়ন করা হয়। অর্থাৎ মনোভাষাবিজ্ঞান হল মনস্তত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক।

খ) মনোভাষাবিজ্ঞান হল ভাষাবিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে একটি শিশুর ভাষা শেখার ক্ষমতা, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়। মানুষের মস্তিষ্ক এখানে প্রধান ভূমিকা পালন করে।

গ) মনোভাষাবিজ্ঞানে ভাষা তৈরির উপাদানগুলিকে শ্রেণি অনুসারে বিভাজন করা হয়। যেমন—ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, বাচন, ধারণা, অর্থ ইত্যাদি। রাগ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, ঘৃণা, ভালোবাসা, স্নেহ ইত্যাদি ইমোশন বা আবেগ এখানে খুব সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে।

ঘ) মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ যেমন—ব্রোকাস এরিয়া, ভোরনিক এরিয়া, হেসলেস জাইরাম, বিভিন্ন ধরনের স্নায়ু ও স্নায়ুতন্ত্রের অংশ মানুষকে ভাষা শিখতে, কথা বলতে, ভাষা বুঝতে এবং মৌখিক ও লিখিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে সাহায্য করে। চমস্কি এগুলিকে ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যাকাল্টি হিসাবে অভিহিত করেছেন। মনোভাষাবিজ্ঞানে এই ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্যাকাল্টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ঙ) গুরু মস্তিষ্কের একটি বিশেষ অঞ্চল ভাষা-প্রক্রিয়াজাতকরণ বা procesing করতে সাহায্য করে। একে 'ল্যাঙ্গুয়েজ কর্টেক্স' বলে। এর অন্তর্গত আরও ক্ষুদ্রতর অঞ্চল যার নাম 'ব্রোকার'। অঞ্চলটি মানুষের কথা বলা, কথার অভিব্যক্তি ও কথার বোধগম্যতা প্রভৃতি কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। মানব মস্তিষ্কের দুই দিক সেটা হল, বামদিক ও ডানদিক। বামদিকে থাকে লেখা, গণনা, বলা, ভাষা পড়া, বিশ্লেষণ, চিন্তা ইত্যাদির প্রস্তুতি। ডানদিকে থাকে সামাজিক, রোমন্থন, ভাবনা ও বিকাশ, ভাষা ইত্যাদির প্রস্তুতি। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, ভাষাবোধের ক্ষেত্রে মাথার ডান গোলার্ধের থেকে বাম গোলার্ধের ভূমিকাই বেশি। মনোভাষাবিজ্ঞান মস্তিষ্কের এই বিভিন্ন অংশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে।

চ) ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে, শিশুর ভাষা শেখার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান তার মধ্যেই নিহিত থাকে। জিনগতভাবে শিশুরা এই ক্ষমতা পায়। মানব মস্তিষ্কের মধ্যে শিশুর ভাষাসংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদান রয়েছে যার দ্বারা শিশু এই ক্ষমতা অর্জন করে। চমস্কি শিশুর ভাষা শেখার এই উপায়কে বলেছেন Language Acquisition Device বা LAD। আধুনিক মনোভাষাবিজ্ঞানে এই LAD Acquis নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চলছে। ভাষাশিক্ষা সম্পর্কে চমস্কির দুটি প্রধান দিক হল ভাষা শিক্ষার উপায় (Language Acquisition Device বা LAD) ও সার্বিক ব্যাকরণ (Universal Grammar)।

ছ) মনোভাষাবিজ্ঞানে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের পাশাপাশি তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও স্নায়বিক প্রক্রিয়াকেও অনুসন্ধান করা হয়।

জ) এই ভাষাবিজ্ঞানে শিশুর ভাষা শেখার ক্ষেত্রে জিনগত ফ্যাক্টরের পাশাপাশি বাহ্যিক পরিবেশ থেকে আগত উদ্দীপনা ও তার প্রতিক্রিয়ার উপরেও জোর দেওয়া হয়েছে।

ঝ) মনোভাষাবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল, শিশুর ভাষা শেখার মধ্যে দিয়ে তাদের বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতিস্তর ও মানসিক ক্ষমতার পরীক্ষা করা। শিশুদের কথা বলা, বোঝা ও ভাষা প্রয়োগ করা তাদের অন্যতম আলোচনার বিষয়। গবেষণার বিষয়ে মনোভাষাবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞানের কাছাকাছি। আর গবেষণা পদ্ধতিতে এটি মনোবিজ্ঞানের কাছাকাছি।

ঞ) এই ভাষাবিজ্ঞানে যে শুধু শিশুর ভাষা শেখার বিষয়টি আলোচিত হয় তা কিন্তু নয়, শিশুর জন্মগত বুদ্ধির বিকাশ, জিনগত সমস্যা, স্মৃতির পার্থক্য, অনুভূতির গভীরতা প্রভৃতি বিষয়ের ওপরও ভাষা শেখার অগ্রগতি বা দুর্বলতা নির্ভরশীল।

ট) মনোভাষাবিজ্ঞানের সঙ্গে তাই স্নায়ুভাষাবিজ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক। পরস্পরের পরিপূরকও বলা যেতে পারে।

চার.

শিশুরা ছোট থেকেই বড়দের নকল করতে শেখে। শুরু হয় মা, বাবা ও পরিবারের সদস্যদের কথা শোনা ও তাদের কথাকে নকল করা দিয়ে। ফলে শিশুরা যে পরিবেশে বেড়ে ওঠে তার পারিপার্শ্বিক মানুষজন ও তাদের ভাষা ব্যবহার অনুকরণ করে ভাষা শেখা বা ভাষা বলার চেষ্টা করে। এটাই শিশুর ভাষা শেখার প্রাথমিক পদ্ধতি। ভাষাতাত্ত্বিক নোয়াম চমস্কি মস্তিষ্ক নির্ভর ক্ষমতার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যেই ভাষা

শেখার সামর্থ্য থাকে। তাই তিনি মস্তিষ্ককে ভাষা শেখার যন্ত্র (Language Acquisition Device বা LAD) হিসেবে অভিহিত করেছেন।

এখন আমরা একটি শিশুর প্রথম ভাষা শেখার পর্যায়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করব। জন্মের পর শিশুর প্রথম ভাষা হল কান্না। শিশুর ঘুম, খিদে, অস্বস্তি, বিরক্তি ইত্যাদি যাই হোক না কেন তার একটাই ভাষা—কান্না। ছয় সপ্তাহ থেকে কান্নার মাঝেমাঝে ওয়া ওয়া শব্দ করে। তিন মাস থেকে কু-কু করে ডাকে। এই ডাক কখনও স্পষ্ট, আবার কখনও অস্পষ্ট হয়। ছয় মাস থেকে বিভিন্ন স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করার চেষ্টা করে। অ, আ, অ্যা,উ ইত্যাদি স্বরধ্বনি এবং ক, গ, ইত্যাদি অল্প কয়েকটি ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ করে। দশ মাস থেকে এক কথার সুর বলার চেষ্টা করে। যেমন গা-গা-গা, মা-মা-মা। এক বছর থেকে এক শব্দ বলে। যেমন—মা, মামা, দাদা, বাবা ইত্যাদি। এখানে একটি শব্দ বললেও তা দিয়ে শিশু একটি মিশ্র ভাব প্রকাশ করে। শিশু দেড় বছর থেকে দুই শব্দ বলে। যেমন—মা মা, বল বল।

এই ভাষা অনেকটা টেলিগ্রাফের মতো। তাই একে বলা হয় টেলিগ্রাফিক স্পিচ। শিশু দুই বছর থেকে ছোট ছোট পদ বা পদগুচ্ছ তৈরি করতে শেখে। তিন বছর থেকে ছোট ছোট বাক্য নির্মাণ করতে শেখে। এক্ষেত্রে বেশির ভাগ সরল বাক্য ব্যবহার করে শিশুরা। এই বয়সে সব বাক্য ব্যাকরণসম্মত হয় না। বিভিন্ন সময় ভুল-ভ্রান্তি ঘটে। পাঁচ বছর থেকে বিভিন্ন ধরনের জটিল বাক্য বলতে শেখে। দশ বছর থেকে পরিণত ভাষাগত দক্ষতা অর্জন করতে শেখে। অর্থাৎ সরল, জটিল, যৌগিক, মিশ্র ইত্যাদি গঠনগত বাক্য ও প্রশ্নবোধক, অনুজ্ঞাবাচক, নির্দেশক ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করতে ও পরিবর্তন করতে শেখে।

ভাষাবিজ্ঞানী আব্রাহাম নোয়াম চমস্কি মনোভাষাবিজ্ঞান নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, শিশুর মস্তিষ্কে অবস্থিত ভাষাশিক্ষার প্রক্রিয়া, ভাষা অধিগ্রহণ করার ক্ষমতা, ব্যাকরণ তৈরির ক্ষমতা একত্রিত করে ভাষার যে সার্বিক বোধ তৈরি করেছে তা হল বৈশ্বিক ব্যাকরণ।

ইংরেজি 'Asphasia' শব্দের বাংলা তর্জমা 'বাক্‌রোধ'। যে কোনও মানুষের হঠাৎই বাক্‌রোধ হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে এটা কখনও ক্ষণস্থায়ী হয়, কখনও হয় দীর্ঘস্থায়ী। বাক্‌রোধ সাধারণত মস্তিস্কের ভাষা এলাকায় আঘাত বা অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়ার কারণে হয়ে থাকে। অনেক সময় অতিরিক্ত মাদকদ্রব্য সেবনও বাক্‌রোধের অন্যতম কারণ বলে ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেছেন। আমরা সাময়িক উত্তেজনার কারণে হঠাৎই ক্ষণস্থায়ীভাবে বাক্‌রোধের শিকার হই। আবার এটি যখন দীর্ঘস্থায়ী হয় তখন সমস্যা প্রবল হয়। শুধু কথা বলাই নয়, লিখতে-পড়তেও সমস্যা হয়। মস্তিষ্কে বাক্‌রোধের এলাকাগুলি প্রথমে চিহ্নিত করা যেতে পারে। আগে দেখে নেব কীভাবে আমরা কথা বলি; লিখি বা পড়ি। কথা বলা, লেখা বা পড়ার ক্ষেত্রে সাধারণত মস্তিষ্কের অনুভূতি ও স্নায়ুকেন্দ্রগুলিতে ধ্বনিতরঙ্গ পৌঁছে যায়।

কথা বলার ক্ষেত্রে তরঙ্গশ্রুতি অনুভূতির এলাকা থেকে চলে যায় শ্রুতি মনস্তত্ত্বের কেন্দ্রে। অতঃপর সেটা ভাষা এলাকা হয়ে উত্তেজনা মোটর কেন্দ্রে যায়। সেখান থেকেই স্নায়ুর মাধ্যমে বাগযন্ত্রে নানা কথাবার্তা আসে। অতঃপর মানুষ কথা বলে। উল্লেখ্য, শ্রুতি মনস্তত্ত্ব থাকে মস্তিষ্কের এক দিকে। কিন্তু শ্রুতি অনুভূতি কেন্দ্র মস্তিষ্কের দু'দিকেই থাকে। লেখার সময় অনুভূতিগুলি দৃশ্য অনুভূতির কেন্দ্র থেকে পৌঁছোয় দৃশ্য মনস্তত্ত্বের জায়গায়। অতঃপর সেটা লেখার কেন্দ্র হয়ে উত্তেজনা মোটর কেন্দ্রে পৌঁছে যায়। সবশেষে লেখার জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পৌঁছে যায়। মানুষ লেখা শুরু করে।

পড়ার সময় চোখ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। এই পর্বে দৃশ্য অনুভূতি, দৃশ্য মনস্তত্ত্ব ও শ্রুতি মনস্তত্ত্ব হয়ে ফিরে আসে দৃশ্য মনস্তত্ত্বের জায়গায়। সেখান থেকে কথা বলার কেন্দ্র হয়ে উত্তেজনা মোটর কেন্দ্রে পৌঁছোয়। দেখা ও শোনা উভয়কে কাজে লাগিয়ে মানুষ পড়ার কাজটি করে চলে।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে কথা বলা, লেখা বা পড়ার ক্ষেত্রে যখন মস্তিষ্কের যে সব প্রত্যঙ্গ এবং অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গ কাজ করা থেকে বিরত থাকে তখনই বাক্‌রোধের ব্যাপারটা আসে। এখন প্রশ্ন, মস্তিষ্কের কোন এলাকায় অসুবিধা হলে বাক্‌রোধের প্রশ্নটি আসে? সেগুলি নিম্নরূপ—

ক) মস্তিষ্কের উত্তেজনা মোটর কেন্দ্রই হল বাকসৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র। এই এলাকায় আঘাত হলে বাক্‌রোধ দেখা যায়।

খ) দৃশ্য অনুভূতি ও দৃশ্য মনস্তত্ত্ব এলাকায় আঘাত হলে বাক্‌রোধ হয়ে থাকে।

গ) স্পিচ সেন্টারে যদি কখনও আঘাত লাগে তখনও বাক্‌রোধ ঘটতে দেখা যায়।

ঘ) শ্রুতি মনস্তত্ত্ব ও শ্রুতি অনুভূতির এলাকায় আঘাত লাগলেও বাক্‌রোধ হয়ে থাকে।

ঙ) মস্তিষ্কের Cerebrum-এ আঘাত লাগলে মস্তিষ্কের ক্ষতি হয়। ফলে বাক্‌রোধের ব্যাপারটা আসে।

এ ছাড়াও মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে তার প্রভাব পরে বিভিন্ন জায়গায়। হাতের আঙুল ঠিক থাকলেও লিখতে পারে না। চোখ ঠিকঠাক থাকলেও লেখা পড়তে না পারা বা লেখার চিহ্ন বুঝতে না পারার বিষয়টি আসে। অনেক সময় নিজের বলা কথা নিজেই ভুল বোঝে মানুষেরা। যে কোনও বস্তুর নাম নির্ধারণে অসুবিধা বোধ করে। শব্দ উচ্চারণে সমস্যার পাশাপাশি কথ্য শব্দ বোঝার অক্ষমতা দেখা যায়। অনেক সময় সামগ্রিকভাবে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়।

৪০৫.১.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। মনোভাষাবিজ্ঞান বলতে কী বোঝো? মনোভাষাবিজ্ঞানে কোন কোন প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়ে থাকে তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

২। মনোভাষাবিজ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা করে এর বৈশিষ্ট্যগুলি লেখো।

৩। একটা শিশু ছোট থেকে কীভাবে ভাষাকে আয়ত্ত্ব করে তা মনোভাষাবিজ্ঞানের আলোকে লিপিবদ্ধ করো।

৪। মনোভাষাবিজ্ঞানের আলোকে মানুষের বাক্‌রোধ ও মস্তিষ্কের ভাষা এলাকা চিহ্নিত করো।

৪০৫.১.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। ড. সুখেন বিশ্বাস, ‘প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা’ (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

২। ড. সুখেন বিশ্বাস, ‘প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা’ (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। ড. সুখেন বিশ্বাস, ‘ভাষাবিজ্ঞান তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ’ (২০২২), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, ‘বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে’, ২০১৩, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক-১

'নৈঃশব্দ্যের ভাষা'

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.২.১.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.২.১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.২.১.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.২.১.১ : মুখবন্ধ

'নিঃশব্দের তর্জনী'-তে শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন "বড়ো শক্ত ধাঁধা জানে ছোটো একটি মেয়ে। কথা বললেই কোন্ জিনিস ভেঙে যায়? আরো শক্ত জানতেন অবশ্য দার্শনিক কীয়ের্কেগার্ড, তাঁর ডায়ারিতে যখন তিনি প্রশ্ন করেন, ঈশ্বর বিষয়ে মানুষের কি কিছু বলার অধিকার আছে আরেক মানুষকে? কেননা তখন তো, তাঁর মনে হয়, টুকরো টুকরো হয়ে যাবে পরমের সঙ্গে সম্পর্ক, আর সেই সম্পর্কেরই তো অন্য নাম নীরবতা।" আর ঠিক এরপরেই আসছে সেই অমোঘ উচ্চারণ "কিন্তু এমনও কথা কি নেই যাতে নীরবও গ'ড়ে ওঠে?" কথার পাশাপাশি, ঠিক এই জায়গা থেকেই শুরু হয় নৈঃশব্দ্যের ভাষা।

চুপ করে থাকার বিশেষ কোনও প্রয়োজন না থাকলে, কথা না বলে আমরা থাকতে পারি না। জন্মের আগে থেকেই কথা শুনতে (শিশুরা সাত মাস বয়স থেকেই নাকি মায়ের কথার স্বর চিনতে পারে) এবং জন্মের পরে সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই গড়গড় করে কথা বলতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই। প্রতিটি স্বাভাবিক মানব শিশু প্রথম নৈঃশব্দ্য ভাঙে তার কান্না দিয়ে। তারপর কু-কু আওয়াজ (cooing) এবং কলধ্বনি (babbling) পর্বগুলো আসে পর্যায়ক্রমে। যখন শিশুর মুখে কোনও শব্দ ফোটেনি তখন সে অকারণেই নানা বিচিত্র আওয়াজ করতে থাকে। যেন কথার ধ্বনি নিয়ে সে খেলা করছে আর তা নৈঃশব্দ্য ভাঙার জন্যেই। এই নৈঃশব্দ্য না ভাঙলে তো আর মানুষে মানুষে যোগসূত্র তৈরি হয় না। শুধু তাই নয়, বিচ্ছেদ ঘটাতে হলেও কথা বলতে হয়। আবার নৈঃশব্দ্য

কখনও কখনও কথাকে নিরস্ত করে, প্রগল্‌ভতাকে তিরস্কার করে। অনেক কথা বলার পরে আমরা যেমন নৈঃশব্দ্য প্রার্থনা করি, তেমনি আবার অনেক কথা শোনার পরেও। আসলে যা শুনলাম তা নিয়ে ভাববার জন্য নৈঃশব্দ্য। যা বলব বা বললাম তা নিয়ে ভাববার জন্য নৈঃশব্দ্য। সুতরাং কথা যেমন মানুষের, তেমনি নৈঃশব্দ্যও মানুষের। তাই তো শঙ্খ ঘোষকে বলতে শুনি "বাড়ি ফিরে মনে হয় বড়ো বেশি কথা বলা হলো?/চতুরতা, ক্লান্ত লাগে খুব?" বা গদ্যে লিখছেন "সমস্ত দিনের পর গভীর রাতে বাড়ি ফিরে গ্লানির মতো লাগে। কথা, কথা। যেন একটু চুপ ছিল না কোথাও, থাকতে নেই, হাতে হাত রাখতে নেই।"

ভাষার ব্যাকরণ বলে, কথার অন্যতম উপায় হল বাক্য। এই বাক্যের সীমানায় রয়েছে দুটি নৈঃশব্দ্য রেখা। এর মানে এক নৈঃশব্দ্য ভেঙে বাক্য শুরু করা এবং আরেক নৈঃশব্দ্যে গিয়ে বাক্যটিকে শেষ করা। অর্থাৎ যার পর থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় বাক্যটি। টানা কথার স্রোতে বাক্যের মধ্যে থাকা দুই নৈঃশব্দ্যের দেওয়াল আমাদের শ্রুতিতে ধরা না পড়লেও ব্যাকরণে তা আছে। এমনকি দুই পদবন্ধ (phrase) অথবা শব্দের মধ্যেও রয়েছে সেই দেওয়াল। আবার বাক্যের চেয়ে বড় খণ্ড, যেমন অনুচ্ছেদের আগে বা পরে একটু বিরাম আছে। সেটাকে কখনও ধরা যায়, কখনও যায় না।

এছাড়াও, কথার প্রয়োগে আমরা আরো অনেক রকমের নৈঃশব্দ্য ব্যবহার করি। যেমন একটা চমকপ্রদ কিংবা শ্রোতাদের কাছে অপ্রত্যাশিত খবর জানাচ্ছেন কেউ "আপনারা কি জানেন যে এই ঘোষণাটি করেছেন স্বয়ং" (বলে নাটকীয় বিরাম)। তারপরে হয়তো বিস্ফোরণের মতো 'রাষ্ট্রপতি'! কথাটা ছিটকে বেরিয়ে আসে। নাট্যকার বা অভিনেতারা এই নাটকীয় বিরাম বা দ্মথন্ডস্ত্র-এর চমৎকার ব্যবহার করেন। বস্তুতপক্ষে সুবক্তা এবং সু-অভিনেতাদের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে থাকে, তাঁরা কথার সার্থক উচ্চারণের সঙ্গে নৈঃশব্দ্যকে কতটা নির্বাচন এবং নিয়ন্ত্রন করতে পারছেন তার ওপর। এটা আসলে নৈঃশব্দ্যের নন্দনতত্ত্বের অংশ। নৈঃশব্দ্য শুধু কথাকে আকর্ষকই করে তোলে না, নিজেও সেই আকর্ষনের উৎস হয়ে ওঠে। আবার অনান্দনিক নৈঃশব্দ্যও আছে যেখানে বক্তা কথা খুঁজে পান না। অনেকে এই অবাঞ্ছিত নৈঃশব্দ্যকে এড়ানোর জন্য 'মানে', 'কিন্তু', 'ইয়ে', 'ঈশে', 'ব্যাপারটা হল' ইত্যাদি আমতা আমতা শব্দ ব্যবহার করেন। ইংরেজিতে আমরা যাকে বলি Hesitation phenomena। এ থেকে বোঝা যায় মানুষের কথা বলার স্বাভাবিক গতি আছে। তার চেয়ে লয় ধীরে বা দ্রুত হলেই তা আমাদের চোখে অস্বাভাবিক বোধ হয়।

ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চম্‌স্কি বলছেন, কথা বলা বা মানুষের ভাষা ব্যবহার হল, ধ্বনির পর ধ্বনি জুড়ে অর্থ প্রকাশ করা। কিন্তু শুধু কথা বলেই কি আমরা অর্থ প্রকাশ করি? অনেক সময় চুপ করে থেকেও অর্থ প্রকাশ করা যায়। কবির কথায় বলতে পারি "ফুলগুলি যেন কথা, / পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার / পুঞ্জিত নীরবতা।"

কথা না থাকলে নৈঃশব্দ্য অর্থময় হতো না। তাই মূকাভিনয় তখনই অর্থময় হয়ে ওঠে যখন আমরা কথা দিয়ে তার অর্থকে বুঝে নিই। মূকাভিনয় এমন একটা শিল্প, যা শুধুমাত্র নৈঃশব্দ্যকে ব্যবহার করে না। একই সঙ্গে মুখচোখ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নানান অর্থময় আচরণ ও ভাবভঙ্গিকে ব্যবহার করে। এই অঙ্গভাষা বা gesture language ভাষার সঙ্গে সঙ্গত দেয়। অর্থাৎ ভাষা একদিকে অঙ্গভঙ্গিকে যেমন অর্থপূর্ণ করে তোলে তেমনই অঙ্গভঙ্গি মূকাভিনয়কে স্পষ্ট করে।

আগেই বলা হয়েছে অতি শৈশবে শিশু কান্না দিয়ে তার নৈঃশব্দ্যকে প্রতিহত করে। আবার জীবনের শেষ লগ্নে সে নীরব হয়ে যায়। সেই জৈবিক নৈঃশব্দ্য আসে ঘুমের মধ্যেও। অনেক মানুষ যেমন স্বভাবতই বাচাল আবার অনেকেই স্বল্পবাক্‌। বিষয়টিকে উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা যাক আচ্ছন্ন হয়ে কোনও অভিকরণ বা

performance দেখার সময় নাচ, গান, নাটক, চলচ্চিত্র, ভিডিয়ো ইত্যাদির শ্রোতা বা দর্শক স্তব্ধ থাকবে। এটা একটা সামাজিক ব্যবস্থাপনার অঙ্গ। শ্রোতা বা দর্শকের ভূমিকা মূলত নিঃশব্দ থাকা। এ যেন ভদ্রলোকের চুক্তি। তবে কোনও কোনও দর্শক আবেগের বশে এই চুক্তিসম্মত নৈঃশব্দ্য ভাঙেন 'দারুণ!', 'কেয়াবাত!', 'চমৎকার!', 'ব্রাভো!' ইত্যাদি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। আবার তরুণ প্রজন্ম রোমান্টিক দৃশ্যে সজোরে সিটি বাজিয়ে বা শেয়ালের ডাক ডেকে নৈঃশব্দ্যকে ভেঙে দেয় সামাজিক চুক্তি বা শর্তকে লঙ্ঘন করে। বিনোদন উপভোগ করার জন্যে যে নৈঃশব্দ্যের বাতাবরণ সমাজ আমাদের জন্যে তৈরি করেছে, কেউ তা ভাঙলে অন্যরা সহ্য করে বটে কিন্তু মনে মনে তা অনুমোদন করে না।

আমাদের সমাজ বা প্রতিবেশ প্রায়ই একমুখী বয়ানের ব্যবস্থা করে রাখে। সেখানে সংলাপের কোনও সুযোগ নেই। রাজনৈতিক নেতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবেন, শিক্ষক ক্লাসে পড়াবেন, ধর্মগুরু উপদেশ দেবেন তখন একপক্ষ নিঃশব্দে শুনবেন এটাই কাম্য। এই নৈঃশব্দ্য ঠিক শান্তি নয়, এ যেন অনেকটা আগের ওই ভদ্রলোকের চুক্তির মতো। এতে আধিপত্যের চিহ্ন আছে। এইসব জায়গায় একজনই সাধারণত বলবে, অন্যেরা চুপ করে থাকবে। কথা বলার সুযোগ থাকলেও তা শর্তসাপেক্ষ। আধিপত্য চাপানো নৈঃশব্দ্য অনেক সময় শাস্তির চেহারাও নেয়। ক্লাসে ছেলেমেয়েরা গোলমাল করলে শিক্ষক নানা রকম শাস্তি দিতেন বেত্রাঘাত থেকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে রাখা পর্যন্ত। বিলেতে বাড়িতে বাচ্ছা দুষ্টমি করলে অভিভাবকেরা তাকে ঘরের কোণে চেয়ারে বসিয়ে চুপ করে থাকতে বলেন। এখানে শাস্তি কিছুটা খেলার চেহারা নেয় বলে ততটাও দুঃসহ হয়ে ওঠে না। কিন্তু এই চাপানো নৈঃশব্দ্যেও আধিপত্যের দাগ আছে। এতে একপক্ষ সামাজিক-পারিবারিক হিসেবে বেশি শক্তিশালী অন্যপক্ষ তুলনায় দুর্বল। শক্তিমানের শাস্তি দেওয়ার অধিকার সমাজ স্বীকৃত।

আবার অনেক সময় শক্তিশালী ভাষা যে দুর্বল ভাষাকে মেরে ফেলে, এও এক মারাত্মক নৈঃশব্দ্যের আরোপ। পৃথিবীর অনেক সংস্কৃতিতেই এমন ঘটেছে। চুপ! বা হিন্দিতে চোপ্! কথাটি অনেক সময় এক প্রবল ও বজ্রকণ্ঠ ধমক হিসেবে দেখা দেয় আমাদের কাছে ইংরেজি shut up! এর জোর হয়তো আরও বেশি। এখানেও একটা আধিপত্যের জোর। ঝগড়ার সময়ে মনের মধ্যে জড়ো হওয়া ক্রোধ আমাদের মধ্যে একটা কৃত্রিম আধিপত্যবোধ গড়ে তোলে, তারই উচ্চারণ এই শব্দগুলো। আধিপত্যের এই স্পষ্ট এলাকাগুলো ছাড়াও খানিকটা সমস্তরের মানুষদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা বা বার্তালাপের সময় সাধারণত একটা নৈঃশব্দ্যের চুক্তি দরকার হয়। তাকে ইংরেজিতে বলে taking turns। আমরা প্রায়ই অবশ্য সে চুক্তি ভাঙি। একজন কথা শেষ না করলেও তার মধ্যে নিজেদের কথা ঢুকিয়ে দিই। taking turns বা নিজের পালা এলে কথা বলা, বাকি সময়টুকু চুপ করে শোনা সামাজিক শিষ্টাচারের অঙ্গ।

ভাষা দ্বিমুখী অর্থাৎ তার একজন বক্তা আর একজন শ্রোতা দরকার। তেমনই নৈঃশব্দ্যও দ্বিমুখীতারও একটা লক্ষ্য থাকে। অর্থাৎ নৈঃশব্দ্য শুধুই নিজের জন্যে নয়, অন্যকেও তা কিছু বলতে চায়। তাই বারবার বলে আসা একই কথার নিষ্ফলতা অনুভব করে প্রতিবাদ স্বরূপ নৈঃশব্দ্যকে নির্বাচন করা " না, না, বলব না কিছুই। / রোজ রোজ এই একই কথা বলতে বলতে ধ্বস্ত হয়ে গেছি- / অর্থহীন লাগে শব্দগুলি।"

আবার আনুষ্ঠানিক নৈঃশব্দ্য ধর্মপালনের অঙ্গ। ধ্যান বা meditation-ও এক ধরনের আচারিক নৈঃশব্দ্যকে গ্রহণ করে। আর এক ধরনের নৈঃশব্দ্য আসে ভয় থেকে কথা বললে নিজের বা অন্যের বিপদ হবে। আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অনেক সময়ে সাক্ষী সরকারী উকিলের জেরায় উত্তরে হ্যাঁ বা না বলতে চান না বা কোনও উত্তর দেন না। এই অজুহাতে যে উত্তর দিলে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

কথা মানুষের অন্তর্গত স্বাধীনতার প্রতীক। কথাই মানুষকে তার অস্তিত্বের মূল অধিকার দিয়েছে। মানুষ কথা বলবেই। কাজেই কথা বলার সময় মিথ্যা থেকে সত্য যেমন নির্বাচন করতে হবে তেমনই নৈঃশব্দ্যও নির্বাচন করতে হবে। এই সূত্রেই মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথ ব্যবহৃত কবি জন ডানের সেই বিখ্যাত দুটি লাইন "For heaven's sake, hold your tongue, and let me love" "দোহাই তোদের একটুকু চুপ কর, ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর"।

৪০৫.২.১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নৈঃশব্দ্য কখন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে? স্বনির্বাচিত নৈঃশব্দ্যের ও আরোপিত নৈঃশব্দ্যের ভাষাকে কীভাবে আলাদা করবে?

২। নৈঃশব্দ্যের ব্যাকরণ বলতে কী বোঝ? এই ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৩। 'হেজিটেশন ফেনোমেনা' (Hesitation Phenomena) বলতে কী বোঝ? এর বিপরীতে কি নান্দনিক নৈঃশব্দ্যকে রাখা যায়? দুটির মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করো।

৪০৫.২.১.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'বহুরূপে ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০১৬, প্রতিভাস, কলকাতা

২। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', (২০২২), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে' (২০১৩), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক-২

‘সমালোচনার ভাষা’

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.২.২.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.২.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.২.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.২.২.১ : মুখবন্ধ

“প্রাপ্য জিনিসের চেয়ে ফাউ যেমন বেশি ভালো লাগে তেমনি অধিকাংশ সময়ই অপ্রাসঙ্গিক কথাতেই বেশি আমোদ পাওয়া যায়; মূল কথাটার চেয়ে আশেপাশের কথাটা...বেশি মনোরম বোধ হয়।”কথাগুলো বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙালি জীবনে ‘নেই কাজ তো খই ভাজ’ এই প্রবাদ যেন সবথেকে বেশি খাটে। তাই অন্যের সমালোচনা ছাড়া বাঙালির জীবনযাপন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাতে ঘুমোতে যাওয়া অবধি সমালোচনায় মুখর আমাদের লোকসমাজ। কলতলা, স্নানের ঘাট, অফিস, স্টেশন, চায়ের ঠেক, টিভি পর্দার বিনোদন কিংবা এফ.এমের টিউনিংসর্বত্রই সমালোচনার ব্যস্ত বাজার। সমালোচনার ব্যস্ত কেনাকাটা। ‘সাহিত্যের বিচারক’-এর মতো সর্বত্র মানুষের বিচক্ষণ সমালোচনার ব্যবসাদারিত্ব। কথার ওজন নিয়ে তাদের হাঁক-ডাক, তর্জন-গর্জন। সে জীবন হোক বা শিল্প-সাহিত্যসমালোচনার এই বহর সর্বত্র। তবে যথার্থ সমালোচনা সৃজনশীলতার স্ফুরণ ঘটায়, একথা বারবার গুণীজনেরা উচ্চারণ করেছেন।

উজ্জলকুমার মজুমদারের মতে, সমালোচনার ভাষার নানা স্তর আছে। নৈঃশব্দ্য বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমেও সাধারণভাবে এই ভালো-মন্দ লাগার বা সমালোচনার আভাস পাওয়া যায়। তবে ভাষার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত সমালোচনার বৈচিত্র নির্ভর করে যিনি সমালোচনা করছেন, তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, পরিবেশ-পরিস্থিতি, রুচি, উদ্দেশ্য-অভিমুখ ইত্যাদির উপরে।

বাংলা সাহিত্যের আদি মধ্যযুগের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য নিদর্শন বড়ু চণ্ডীদাস বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। সেখানে বড়ায়ীর বয়ানে উদ্ধৃত হয়েছে"ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়ীবাক পারী/উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারী/যে পুণি আধম জন আন্তরে কপট/তাঁহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট।"রাধার একান্ত অভিভাবক বড়ায়ী জানে, কোনটা সোনার আর কোনটাই বা মাটির ঘট। কৃষ্ণের মতো গ্রাম্য 'ছোঁড়া'-কে নিজের জীবন-অভিজ্ঞতায় তা বুঝিয়ে দিতেই পারে সে।

"তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?"'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে এভাবেই নবকুমারের মধ্যে দিয়ে আত্মসমালোচনার সদর্থক ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। মানুষের নিজের অন্তরের এই যে গভীর সমালোচনার বোধ, তা তো কাঙ্ক্ষিত সমাজকে না পাওয়ারই আক্ষেপের প্রকাশ।

কৃত্তিবাসী 'রামায়ণ'

ব্যক্তি সংকটের অনেক বেশি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতানির্ভর সমালোচনায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। রাম বনবাসে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে দ্বিধা প্রকাশ করলে সেখানে সীতার উক্তি ব্যক্ত হয়েছে এইভাবে "নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে/দেখো তারে 'বীর' বলে, কেন বীর জনে।"এই উক্তির মধ্যে দিয়ে সীতার রামের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ভর্ৎসনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রামের প্রতি সীতার এই ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনার ভাষা সাধারণ, স্পষ্ট, নারী-সত্তার ভাষা হয়ে উঠেছে।

ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এ শিব ঝগড়ার সময় দুর্গাকে 'অলক্ষণা' বললে গৌরীর মুখে শুনতে পাইশিবকে সহায়-সম্বল-সামর্থ্যহীন 'বুড়া' বলে বিদ্ধ করতে। পরবর্তীসময়ে, দুটি সংস্কৃতির সংঘর্ষের সন্ধিকালে সমাজ-সমালোচনার ছড়াছড়ি লক্ষ করা যায়। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শুরু করে মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্র লাল প্রমুখ গদ্যের পাশাপাশি পদ্য ভাষাতেও সমালোচনার তরবারি শানিত করেছিলেন। বৈদেশিক শাসনের ফলে বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতিতে, শিক্ষা-দীক্ষায়, চিন্তায়-মননে আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল; যার রেশ এখনও চলছে। প্রশাসনিক স্বার্থে যোগ্যতার পরিবর্তে বড়ো হয়ে উঠছে পদাধিকার লোভ। যার তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন শিক্ষিত চেতনা। সেই ক্রমক্ষয়িষ্ণু সমাজের সমালোচনায় বারবার এগিয়ে এসেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ইত্যাদির পাশাপাশি অসংখ্য প্রবন্ধে বারবার এই সমাজ-সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। মানুষের ভয়-ভক্তির সুযোগ নিয়ে ঈশ্বর আর মানুষের মাধ্যম হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা পুরোহিত কিংবা শিক্ষিত বাবু সমাজসবার বিরুদ্ধেই চাবুকের মতো কলম চালিয়েছেন লেখক বঙ্কিমচন্দ্র। বুদ্ধি দিয়ে নিজেদেরই নির্বুদ্ধিতার, স্ববিরোধিতা, সুবিধাবাদী মনোবৃত্তিকে সমালোচনা করাই এইসব রচনার গুণ বা রস। পরবর্তীকালে যে রসের উৎস্রোত ঘটিয়েছিলেন গল্পকার রাজশেখর বসু।

কাব্য চর্চার একেবারে যৌবনকালে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে এবং হুজুগে রবীন্দ্রনাথকে বাঙালিদের হয়ে বলতে শুনি"বাঙালি বড় চতুর, তাই/ আপনি বড় হইয়া যায়/অথচ কোন কষ্ট নাই/চেষ্টা নাই তার.../মহৎ মোরা

বঙ্গবাসী/ আর্য্য পরিবার।"নিছক ছড়ার ছন্দের এই দোদুল দোলায় বাঙালির এই আত্ম-সমালোচনা আমাদের নিদ্রাছন্ন বিবেককেই আঘাত করে।

মানব সভ্যতার হয়ে যুদ্ধরত বড় বড় দেশগুলোকে সমালোচনায় তিনি আঘাত হেনে বললেন, "...আজ মানুষ মানুষকে পীড়ন করবার জন্য নিজের এই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যবহার করেছে, তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র আজ তারই বুকে বেজেছে।" যুদ্ধকালীন বিশ্বসভ্যতার দারুণ সংকটেও দেশের এবং দশের মঙ্গল কামনায় আমাদের হয়ে আমাদের 'পাপের মার্জনা' প্রার্থনা করেছেন। এই 'মার্জনা' শব্দটির মধ্যে দিয়ে মানব সভ্যতাকে পরিশোধিত করার কথাটিই তিনি ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এই সমালোচনার ভাষায় 'উচ্ছিষ্ট' থেকে 'তাপরুদিত' মানুষের জয়যাত্রার উত্তরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পে দেখি, কাছারির কাজ সেরে ফিরে আসা দুখিরাম, বউয়ের কাছে ভাত চাইলে বউ গর্জে বলে ওঠে, "ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।" গল্পের পরবর্তী অংশ পাঠকের জানা। দাদাকে নিজের স্ত্রী খুন করার অপরাধ চাপা দিতে গিয়ে ছিদাম বলে, বউ গেলে বউ পাব, দাদাকে আর পাব না। গল্পকার কী চমৎকার ব্যঞ্জনায় গল্পের শেষে চন্দরার মুখে 'মরণ' শব্দটিকে বসিয়ে পুরুষশাসিত সমাজের প্রতি ঘৃণা, ক্ষোভ, বিদ্বেষকে প্রকাশ করেছেন। সামাজিক প্রথায় আবদ্ধ জীবনের মর্মান্তিক সত্যটিকে ওই একটি শব্দে ফুটিয়ে তুলেছেন।

আবার কোথাও সমালোচকই স্রষ্টার সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে গেছেন সমালোচনার সৌন্দর্য্যে, প্রাচুর্য্যে। মূল আলোচনার বিষয়কে ছাপিয়ে গিয়ে সমালোচকের আলোচনা হয়ে উঠেছে একেবারে নিজস্ব সৃষ্টি। যেমন, কালিদাসের মেঘদূত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা। যক্ষের বিরহকে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছে দিয়েছেন অসীমের চেতনায়। কালিদাসের কালের সামগ্রিক ঐশ্বর্য্য থেকে আমাদের বিচ্ছেদ 'চিরবিচ্ছেদচেতনা'-য় আকুলিত হয়ে উঠেছে। প্রিয়জনের বিচ্ছেদের বিশেষ রূপটি এখানে মানুষের অন্তর্নিহিত বিচ্ছেদ চেতনার নির্বিশেষ রূপ। মেঘদূত সেই বিচ্ছেদ ভারাক্রান্ত মানুষের চিরকালীন আশ্রয়। অপ্রাপনীয় অতীতকে পাওয়ার চিরকালীন বাসনা। চিরবিরহের নৈঃশব্দ্য। উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের কথার সুর ধরে বলতে হয়, ক্রমশ সে ভাষায় সমালোচনার নানা 'রূপ-কথা' আমরা পেয়েছি। ব্যাখায়, মিলনের আকাঙ্খায় এভাবেই সমালোচনার 'চুপ-কথা' ফিরে এসেছে বারবার।

৪০৫.২.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। নিত্যদিনের সমালোচনা কীভাবে সমালোচনার ভাষাশৈলী নির্মাণ করে তা দেখাও। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর বিশিষ্ট প্রয়োগ উল্লেখ করো।

২। 'সমালোচনার ভাষা' বলতে কী বোঝায়? মধ্যযুগের সাহিত্যে ও আধুনিক সাহিত্যে সমালোচনার ভাষাশৈলী কীভাবে নির্মাণ করা হয়, তা নিজের ভাষায় লেখো।

৪০৫.২.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'বহুরূপে ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০১৫, প্রতিভাস, কলকাতা

২। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', (২০২২), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে' (২০১৩), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক-৩

‘পদ্যভাষা’

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.২.৩.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.২.৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.২.৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.২.৩.১ : মুখবন্ধ

“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম।”

আদিকবির মহাকাব্যিক চেতনায় উচ্চারিত এই শ্লোক সম্ভবত পৃথিবীর বুকে প্রথম সার্থক পদ্য-স্ফুরণ। সমস্ত পৃথিবীর হয়ে বেদনার নিভৃত বাণীটিকে শ্লোকের মধ্যে বেঁধে দিয়ে পদ্যের গতিপথ এঁকে দিলেন মহর্ষি। পদ্য বলতে সাধারণভাবে ছন্দোবদ্ধ নিয়মিত পর্বে বিন্যস্ত চরণকে বুঝি। পদ্য পাঠককে অনুভূতির উচ্চস্তরে নিয়ে যায়, যেখানে ছন্দ-মিল ধ্বনির নিয়মিত ব্যবহারে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যা পাঠকের শ্রুতিকে ও চিত্তকে মুগ্ধ করে। পাঠককে নিয়ে যায় অন্য জগতে। সেই ‘সুন্দর জটিল পাককেহীরের ছুরি’ দিয়ে কেটে যারা নির্মাণ করেন পদ্যকে, তাঁরা হলেন পদ্যকার। গদ্য, পদ্যের তুলনায় আধুনিক; জীবন-জিজ্ঞাসার অন্যতম বাহন। পদ্য সুপ্রাচীন। প্রাণোচ্ছল। আধুনিককালে পদ্যের অর্থ ব্যাপক। মনের ভাবনা, কল্পনা ইত্যাদি অনুভূতি রঞ্জিত হয়ে যথাযথ শব্দসম্ভারে বাস্তব সুষমামণ্ডিত চিত্রাত্মক ও ছন্দময় রূপই হল পদ্য। পদ্যরূপের পদ-বিন্যাস, শব্দ-প্রয়োগ, ক্রিয়ার ব্যবহার গদ্যরূপের মত নয়।

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, লোকমুখে ছড়ার সুরে প্রচলিত সুপ্রাচীন পদ্য থেকেই বাঙালির সাহিত্য নির্মাণের যাত্রাপথের শুরু। শুরু পদ্যভাষার আনন্দ-অভিযাত্রার। প্রাচীন চর্য্যার পদে সেই পদ্যের আশ্চর্য্য প্রকাশ “ভবণই গহণ

গম্ভীর বেগেঁ বাহী।/দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।।/ধামার্থে চাটিল সাঙ্কম গঢ়ই।/পারগামি লোঅ নিডর তরই।"

বাংলা পদ্যভাষার আজকের যে পরিশীলিত রূপ তার মূলসুরটি কিন্তু চর্য্যাপদেই নিহিত ছিল। এমনকি পদ্যের ছন্দ ও অন্ত্যমিল, তাও হাজার বছরের প্রাচীন চর্য্যাগীতিরই দান। চর্য্যাপদগুলো বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের সাধনতন্ত্রের গুহ্য সংকেত হলেও এর ভাষাসৌন্দর্য্য সাধারণ পাঠককে আকর্ষিত করে।

চর্য্যাপদের পরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক নাটকীয় বর্ণনা পদ্যের পরতে পরতে বুনে দিল আখ্যানের সুর"কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।/কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।/আকুল শরীর মোর বেয়াকুল মন।/বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।/কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।/দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা।" বাঁশি বা সুরের প্রাধান্য অর্থাৎ কীর্তন এবং কাহিনির সাবলীল গতি বাংলা কবিতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল গোটা মধ্যযুগ ধরে।

ব্যতিক্রম বৈষ্ণব পদাবলী। রাধা-কৃষ্ণ এর উপলক্ষ্য হলেও লক্ষ্য লৌকিক নরনারী। রোমান্টিসিজম ও গীতিমূর্ছনার প্রাবল্য পদগুলোতে অলৌকিক পরিবেশ রচনা করেছে। পার্থিব কবি লৌকিক নরনারীর প্রেমকে অপার্থিব অনুভূতিতে ব্যঞ্জিত করেছেন। হৃদয়গ্রাহী নান্দনিকতার সুরস্পর্শে পদগুলি তাই সহজেই সাধারণ পাঠকচিত্ত কেও বিমোহিত করে তোলে। এখানে উল্লেখ্য, চণ্ডীদাসের পূর্বরাগ পর্যায়ের একটি পদ"সই, কেবা শুনাইল শ্যামনাম।/কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো/আকুল করিল মোর প্রাণ।।"

পদ্যভাষা সবচেয়ে ঐশ্বর্য্যরূপ লাভ করেছে যুগসন্ধিক্ষণের কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের হাতে। তার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে আমরা দেখি, আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষার সংমিশ্রণে পদ্যভাষার এক নবরূপায়ণ ঘটেছে। প্রাচীন সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ ও বাংলায় তার সার্থক প্রয়োগ বাংলা কাব্যকে অন্যমাত্রা দান করেছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখে নিতে পারি তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের একটি পঙক্তি "বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।/আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি।।/লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।/গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল।।"

এভাবেই নানা বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলা পদ্যভাষার পথচলা। চর্য্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদিকে আশ্রয় করে পদ্যের সীমানা ছড়িয়েছে অনেক দূর। ভারতচন্দ্রের সেই ঐতিহ্য ও উত্ত রাধিকারকে গ্রহণ করেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত নতুনত্ব এনেছেন বাংলা কবিতায়। তিনি বাংলা কাব্যে কেবল মৌলিকতা আনেননি, ছন্দে আনলেন এক নতুন জোয়ার। অমিত্রাক্ষর ছন্দ মধুসূদনের এক বিস্ময়কর মৌলিক আবিষ্কার। চরণান্তিক অনুপ্রাস এখানে অনুপস্থিত। পয়ারের বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াস বিদ্যমান। তিনি বুঝেছিলেন, যে সেকেলে পয়ার ছন্দের আট-ছয় যতিবন্ধনে বন্দি ভাবধারাকে মুক্তি দিতে হলে সর্বপ্রথম পয়ারের ছেদ যতির গতানুগতিক ও কৃত্রিম বন্ধন ছিঁড়ে ফেলে কাব্য পঙক্তিকে ভাবের আবেগ ছেড়ে দিতে হবে। ভাবানুসারে যতিপাত হবে, ছন্দের কৃত্রিম বাঁধনে নয়। এই নিয়মে তিনি বাংলা ভাষাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রবর্তন করলেন। তার এই প্রয়াসে বাংলা কাব্যে ছন্দ মুক্তির সূচনা হয়।

আরও পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা কাব্যে ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক ও রূপরীতিতে নতুনত্ব এবং বৈচিত্র এনেছেন। মধুসূদনের হাতেই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে বাংলা কাব্য সাহিত্যে। আর বাংলা কাব্যকে যিনি বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন সেই কবিগুরুর সুনিপুণ হাতের ছোঁয়ায় বাংলা কাব্য হয়েছে সমৃদ্ধতম। তিনি তাঁর কবিতায় প্রেম, প্রকৃতি, জীবনদেবতা, আধ্যাত্মিক ভাবনা, মৃত্যুচেতনা সুদক্ষ শিল্পীর তুলিতে অঙ্কিত করেছেন"ঠাঁই নাই, ঠাঁই

নাই! ছোট সে তরী/আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি'।/শ্রাবণ গগন ঘিরে/ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,/শূন্য নদীর তীরে/রহিনু পড়ি',/যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।"

কল্লোলযুগে বাংলা কবিতা নতুন মাত্রা পেয়েছে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিদের হাত ধরে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় শব্দের অধিক ব্যঞ্জনা, অর্থবহতা ও সংহত ভাব লক্ষ করা যায়। তিনি চলিত ক্রিয়ার পূর্ণরূপ এবং গ্রাম্য ক্রিয়া ব্যবহার করেছেন 'পিটারে বিদ্রুপডঙ্কা হাটে হাটে করিল ঘোষনা।' এছাড়া অভিনবত্বের পরিচয় রেখেছেন নাম ধাতুর ব্যবহারেও 'লোভায় না লঘু মরীচিকা নির্মাণে;' কবিতায় অব্যয়ের বহুল ব্যবহার করেছেন তিনি'অতএব এসো আমরা সন্ধি করে' কিংবা 'এবং সে নিত্যবিপরীত'। বুদ্ধদেব বসুর কবিতায় কথ্য ক্রিয়াপদ ও কথ্য রীতির মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় 'শতদার নারীমাংসলোভী/ কামুক রাজন্য কুল ছুঁয়ে ছেনে বেড়াতেন ফিরি/ বিশ্বের সুতনু রাশি।' এরপরেই আত্মসচেতন আত্মনিমগ্ন কবি জীবনানন্দের বলিষ্ঠ আবির্ভাবে তার চিন্তা চেতনায়, মননে মেধায়, চিত্রকল্প রচনায়, আঙ্গিক নির্মাণে বাংলা কাব্য স্বকীয় স্বতন্ত্র ধারায় বিস্তার লাভ করেছে। প্রকৃতিকে বাস্তবরূপে তিনি তাঁর কাব্য কবিতায় উপস্থাপন করেছেন"সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,/তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে, বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'/পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।"

বিষ্ণু দের কবিতার শব্দ ও ভাষা যেন একটু ভিন্ন প্রকৃতির। শব্দ ও বাক্য গঠনে কবি মনের পরিপক্কতা খুব সহজেই চোখে পড়ে। তার প্রত্যয়ের সুর সরল, অথচ তীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনাময়"কখনো কি শেষ হয় বাঁচা/ স্বচ্ছ স্রোতে সবুজ ছায়ায়? / সাঁকোর ভাঙে নাকো বাহু,/ গড়ে নাকো ত্বরিতে পল্টুন?" সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় শব্দকে ব্যবহার করেছেন আশ্চর্য্য দক্ষতায়। অসাধারণ বর্ণনাভঙ্গি কবিতার একটি বড় গুণ"ধোঁয়ার জায়গাগুলো নিখুতভাবে ভাবে ফোটালেও/ আমি লক্ষ্য করলাম / আগুনের জায়গাটা / ইচ্ছে করেই যেন চেপে গেল।" শব্দগত বিপ্রতীপতাও এই কবিদের কবিতায় দেখা যায় যেমন জীবনানন্দের কবিতায় 'ঋণ শোধ করে দিতে গিয়ে ঐ অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার' 'রৌদ্র' এবং 'অন্ধকার'কে কী নিপুণ দক্ষতায় ব্যবহার করেছেন কবি। কিংবা বিষ্ণু দের কবিতায়'অন্ধকার দিয়ে ঢাকে লালদীঘির লাল অন্ধকার'। এখানে 'অন্ধকার' শব্দের প্রয়োগ প্রশংসনীয়।

একালের কবিদের হাতেও পদ্যভাষার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। কবিতা হয়ে উঠেছে পাঠকের হৃদয়ের দর্পণ। কবি জয় গোস্বামী তার 'জিভ' কবিতায় মৃত্যুর ভয়াবহ রূপ এঁকেছেন এইভাবে "তুমি এসো এসো তুমি, ওরা ডাকে, কুয়াশায়/ আর বিষে ভরে যায় নভতল।/ জেগেছে শকুন? চিল? ছোঁ মারো!/ লুণ্ঠন শেষ হয়। সকলেই চিৎ আর উপুড়ে/ ভাসে আর ডোবে, আর অবশেষে একদিন স্থায়ী ভার"।

কিংবা একালের কবি যখন দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন "এক বিহ্বল মাংসাশী জ্যোৎস্নায় যারা ভালোবাসতে এসেছিল, তাদের ছুরি বুক পকেটের কলমের চেয়েও শান্ত, বিপন্নতার আর খিদেও পায় না, ঘুমও পায় না। অনবরত স্তব্ধতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এক সময় স্তব্ধতাই হঠাৎ শব্দ হয়ে ওঠে, যেমন কাশ্মীর, এত রক্তপাতের পরও তার স্বাধীনতা কবিতার মতো দুর্গম। যে রাস্তাগুলোয় শব্দ একসময় হেঁটে বেরত, সেখানে এখন জ্যোৎস্না আর ঝরা পাতা।তবু কি দহন চাই, পদ্য চাই না ?" তখন কবিতার এ ভাষা পাঠককে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করে। কবির অনুভূতি কল্পনার রঙে রঞ্জিত হয়ে কাব্যরূপ লাভ করে পাঠককে নন্দিত করবে, কবিতার উদ্দেশ্য তো তেমনই হওয়া উচিত। যেখানে একই ভাবনায় মিলে যাবেন কবি এবং পাঠক দুজনেই, আর তখনই সার্থক হয়ে উঠবে কবির পদ্যভাষা।

৪০৫.২.৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। প্রাচীন যুগের পদ্য ভাষার সঙ্গে বর্তমান কালের পদ্যভাষার তফাৎ কোথায়? একটি তুলনামূলক আলোচনা করে বিষয়টি বুঝিয়ে দাও।

২। পদ্যভাষার স্বরূপটি উল্লেখ করো। এই ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি নিজের ভাষায় লেখো।

৩। বাংলা সাহিত্যে পদ্য ভাষার ক্রমবিবর্তিত রূপটি উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৪০৫.২.৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'বহুরূপে ভাষা' (চতুর্থ খণ্ড), ২০১৭, প্রতিভাস, কলকাতা

২। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', (২০২২), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে' (২০১৩), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক-৪

‘গদ্য ভাষা’

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.২.৪.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.২.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.২.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.২.৪.১ : মুখবন্ধ

গদ্য হল মানুষের ভাবনা-চিন্তার সুনিয়ন্ত্রিত, সুনির্বাচিত বুদ্ধিনিষ্ঠ প্রকাশ। মানুষের কথ্যভাষার লিখিত রূপকেই আমরা গদ্য বলতে পারি। গদ্যের কাজ শুধু বিষয় ভাবনাকে বহন করা নয়, তার নিজস্ব সৌন্দর্য্য দিয়ে পাঠককে আকর্ষণ করার ক্ষমতাও আছে গদ্যভাষার। এবং টেনে রাখার ক্ষমতাও আছে বিষয় নিরপেক্ষভাবে। বক্তব্য বা কাহিনির স্বাদ মানুষ পেতে চায়, তাই ভাষার অন্তর্বয়ন নিজেই একটা আস্বাদনের উৎস। কবিতা হচ্ছে ইঙ্গিতের ভাষা, অন্যদিকে গদ্য ধরতে চায় সম্পূর্ণতাকে। মানুষের বোধের যতটুকু অংশকে মানুষের ভাষায় পাল্টে নেওয়া যায় সেই বিন্দু অবধি পৌঁছতে চাওয়ার সম্ভাবনাকে নিরঙ্কুশ ভাবে ব্যবহার না করা পর্যন্ত গদ্যের স্বস্তি নেই। তাই গদ্য লিখনের কাজটা পরিশ্রমসাধ্য এবং বিপদজনক। কবিতার ভাষা মুহূর্তজাতক কিন্তু গদ্যের ভাষাকে গড়ে তুলতে হয় তিলে তিলে। অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে তার পুষ্টিসাধন করতে হয়। কবিতার ভাষা আকস্মিকভাবে পাওয়া, প্রায় জাদুর মতো বা দৈবাৎ কবির কাছে তার ধরা দেওয়া। অন্যদিকে গদ্যের ভাষা সময়ের দাবিদার। প্রচুর ভাঙ াগড়া, কাঁটাছেড়ার মধ্যে দিয়ে হয়ে ওঠা একটা রসায়ন। গদ্য ভাষার ক্ষেত্রে লেখকের মূল লক্ষ্য থাকে তার চিন্তা ভাবনার সাথে বক্তব্যের ভারসাম্য বজায় রাখা। গদ্যের ভাষা হবে সুমার্জিত। জ্ঞান ও চিন্তার সার্থক বাহন হওয়াই গদ্যের লক্ষ্য এবং এর আবেদন মূলত যুক্তির কাছে।

বাংলা গদ্যভাষার ইতিহাসের দিকে নজর রাখলে আমরা দেখা যাবে , গদ্যভাষা নিজেই নিজের পথ খুঁজে নিয়েছে। পদ্যকে ঠেলে ধীরে ধীরে গদ্যকে দাঁড়াতে হয়েছে। কারণ বাংলা ভাষার শুরুটা ছিল পদ্যকেন্দ্রিক। বাংলা সাহিত্যের আদিযুগে তো বটেই, মধ্যযুগেও মাতামাতি ছিল পদ্যের। গদ্য ছিল মানুষের মুখের ভাষা। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে আসামের রাজাকে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ মল্লদেবের লেখা একটি পত্রকে বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রাথমিক নিদর্শন বলে মনে করা হয়। রোমান ক্যাথলিক পর্তুগিজ পাদ্‌রি মনোএল্‌-দা আস্‌সুম্পসমকর্তৃক ১৭৩৪ খ্রিস্টাব্দে রচিত এবং ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' গ্রন্থটি বাংলা গদ্যের প্রাথমিক প্রচেষ্টার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি ব্যাকরণের নিয়মাবলি লিপিবদ্ধ করেন। চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা গদ্যের ভিত্তি রচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক জীবনে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে দুটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছে শ্রীরামপুরে মিশনের পত্তন (১০ জানুয়ারি, ১৮০০) ও সেই সঙ্গে মুদ্রণ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা আর কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা (৪মে, ১৮০০)। এই মিশনের বিভিন্ন বইয়ে বাংলা গদ্য জায়গা পেয়েছে। ইংরেজ-শাসিত কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ব্রিটিশ কর্মচারীদের বাংলা শেখানোর জন্য কেরি সাহেব নিজে উদ্যোগ নিয়েছেন। এছাড়াও রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ ব্যক্তিদের দিয়ে একের পর এক বাংলা বই লিখিয়েছিলেন, গদ্য ও ব্যাকরণ তৈরি করিয়েছিলেন। সেগুলো বিশেষভাবে সংস্কৃত ও ল্যাটিন ভাষার রীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। কেন না তখন তাদের সামনে বাংলা গদ্যের কোনও সুনির্দিষ্ট আদর্শ ছিল না। তাদের হাতে ধীরে ধীরে বাংলা গদ্যভাষাটি রূপ লাভ করতে থাকে। এবং যাঁরা সে গদ্য শিখছিলেন, তাঁরা সাহিত্য করার জন্য নয়, চাকরি-ব্যবসা-কাজের প্রয়োজনেই সেটি শিখছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। বাংলা লিখতে বসে তিনি নিজস্ব রীতি আবিষ্কার করেছেন। তার গদ্যে আরবি, ফারসি শব্দের সুষ্ঠ প্রয়োগ আছে। সংস্কৃত গদ্যের উপর অতি-নির্ভরতাও লক্ষ্য করা যায়। 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২) গ্রন্থ থেকে তার গদ্যরীতি একটু দেখে নেব-- "এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে এক দিবস এক যোগী রাজ সভায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে আশীর্বাদ পূর্বক তাহার হস্তে এক ফল প্রদান করিল। রাজা তাহা সহাস্য বদনে গ্রহণ করিলে, যোগী কহিল আমার কুটীরে যজ্ঞ হইতেছে, আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছি। রাজা নিমন্ত্রণ স্বীকার পূর্বক কহিলেন আমি সন্ধ্যার সময় তোমার আলয়ে উপস্থিত হইব, তোমার আশ্রম কোথায় বল। অনন্তর যোগী আপন বাসস্থানের পরিচয় দিয়া প্রস্থান করিল।"

জন্ম থেকেই বাংলা গদ্যের ছিল ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা। উইলিয়াম কেরি সাহেব তাদের ধর্মীয় মত প্রকাশের জন্য বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করে সমাচার দর্পণ, দিগদর্শন ইত্যাদি পত্র-পত্রিকাও বের করেছিলেন। উইলিয়াম কেরি সাহেব 'ইতিহাসমালা'য়(১৮১২) লিখেছেন "কোন সাধু লোক ব্যবসায়ের নিমিত্তে সাধুপুর নামে এক নগরে যাইতেছিলেন পথের মধ্যে অতিশয় তৃষ্ণার্ত হইয়া কাতর হইলেন। নিকটে লোকালয় নাই কেবল এক নিবিড় বন ছিল তাহার মধ্যে জলের অন্বেষণে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে তথাতে এক মনুষ্য একাকী রহিয়াছে। ঐ সাধু তাহাকে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কে তোমার বসতি কোথায়! সে কহিলেক আমার নাম খলেশ্বর আমার নিবাস সাধুপুর গ্রামে।"

বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ গদ্য লেখক বলা যেতে পারে প্যারীচাঁদ মিত্রকে। তাঁর ভাষারীতিতে কথ্যভাষা ও সাধুভাষা মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। তদ্ভব, দেশি শব্দ ও ফরাসি শব্দের বহুল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তিনি। সমাসযুক্ত পদ পরিহার করে বাংলা গদ্যকে পরিমিতি দানের চেষ্টা করেছেন। তাঁর রচিত 'আলালের ঘরে দুলাল' ই বাংলা

ভাষায় লেখা আদি গদ্যসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। উপন্যাসটিতে তিনি গুরুগম্ভীর সাধুর বদলে সমাজের সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত চলিত ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। হালকা চালে এর ভাষার বিন্যাস করা হয়েছে। শব্দযোজনা দেখলেই বোঝা যায়, এটি করা হয়েছে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে, সমাজের সর্বস্তরের পাঠকের সুখপাঠ্য করে। 'আলালি ভাষা'র একটু নমুনা এ প্রসঙ্গে দেখে নেওয়া যেতে পারে "অতএব ঠকচাচা ভারি ব্যাঘাত উপস্থিত দেখিল এবং ভাবিল, আশার চাঁদ বুঝি নৈরাশ্যের মেঘে ডুবে গেল, আর প্রকাশ বা না পায়! তিনি মনোমধ্যে অনেক বিবেচনা করিয়া একদিন বাবুরাম বাবুকে বলিলেন বাবুসাহেব! তোমার ছোট লেডকার ভৌল নেগা করে মোর বড় গমি হচ্ছে। মোর মালুম হয়, ওনা দেওয়ানা হয়েছেতেনা মোর উপর বড় খাপ্পা, দশ আদমির নজদিকে বলে, মুই তোমাকে খারাপ করলামএ বাত শুনে মোর দেলে বড় চোট লেগেছে, বাবু সাহেব।" ওআলালের ঘরের দুলাল, ১৮৫৮খ্রি

বিদ্যাসাগরই বাংলা গদ্যের প্রথম সচেতন শিল্পী। তার হাতেই বাংলা গদ্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা। বাংলা গদ্যকে শৃঙ্খলাবদ্ধ, সাবলীল ও সুষম করে তোলেন তিনি। সংস্কৃত গদ্যরীতির আদর্শ পরিহার করে, দীর্ঘ সমাস বহুল বাক্যকে ক্ষুদ্রতর বাক্যে বিভক্ত করেছেন। ধ্বনিসামঞ্জস্যতা, ক্রিয়ারূপ ও শব্দে সরলতা এনেছেন। এইভাবে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তিনি বাংলা গদ্যের কাঠামো নির্মাণ করেছেন "সীতা অন্যদিকে অঙ্গুলী নিদ্দেশ করিয়া বলিলেন, নাথ! দেখুন দেখুন, এদিকে আমাদের দক্ষিণারণ্য প্রবেশ কেমন সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে। আমার স্মরণ হইতেছে, এইস্থানে আমি সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে নিতান্ত ক্লান্ত হইলে, আপনি হস্তস্থিত তালবৃন্ত আমার মস্তকের উপর ধরিয়া, আতপনিবারণ করিয়াছিলেন।" [সীতার বনবাস ১৮৬০]

বিদ্যাসাগরের পরে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে বাংলা গদ্যের যৌবনশ্রী ফুটে উঠেছে। বিদ্যাসাগরী গদ্যরীতির ভিত্তি ভূমির উপর গড়ে উঠেছে বঙ্কিমী গদ্যরীতি। বঙ্কিমচন্দ্রের তীক্ষ্ণ মনন, পরিমিতিবোধ, ঋজুতা, প্রাঞ্জলতা ও শব্দ প্রয়োগের নিপুণতায় বাংলা গদ্য সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যরূপ লাভ করেছে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তা ও সমাজ সচেতনতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ "আমাদের কৃষ্ণ চর্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণসকরুণ মেও মেও শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিঙ্গখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না, যে ধনীর দোষেই দরিদ্রে চোর হয়? পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচশত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে; কেন না অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

রবীন্দ্রনাথে এসে বাংলা গদ্যভাষা এক অপরূপ বাণীরূপ লাভ করেছে। ভারসাম্য যুক্ত বাক্যবিন্যাস, শব্দ ব্যবহারের ঔদার্য্য, স্বচ্ছতা, ঋজুতা ও প্রাঞ্জলতা এসবের মেলবন্ধনে বাংলা গদ্যভাষা চমৎকারিত্ব রূপ পরিগ্রহ করেছে রবীন্দ্রনাথের হাতে"সৃষ্টিতে অনাসৃষ্টিতে মিশিয়ে উপদ্রব চলতে লাগল। মা দেখতে পায় তার মেয়ের ছটফটানি। মনে পড়ে নিজের প্রথম বয়সের জ্বালামুখীর অগ্নিচাঞ্চল্য। মন উদ্‌বিগ্ন হয়। খুব নিবিড় করে পড়াশোনার বেড়া ফাঁদতে থাকে। পুরুষ শিক্ষক রাখল না। একজন বিদুষীকে লাগিয়ে দিল ওর শিক্ষকতায়। নীলার যৌবনের আঁচ লাগত তারও মনে, তুলত তাকে তাতিয়ে অনির্দেশ্য কামনার তপ্তবাষ্পে। মুগ্ধের দল ভিড় করে আসতে লাগল এদিকে ওদিকে। কিন্তু দরওয়াজা বন্ধ। বন্ধুত্বপ্রয়াসিনীরা নিমন্ত্রণ করে চায়ে টেনিসে সিনেমায়, নিমন্ত্রণ পৌঁছয় না কোনো ঠিকানায়। অনেক লোভী ফিরতে লাগল মধুগন্ধভরা আকাশে, কিন্তু কোনো অভাগ্য কাঙাল সোহিনীর ছাড়পত্র পায় না। এদিকে দেখা যায় উৎকণ্ঠিত মেয়ে সুযোগ পেলে উঁকিঝুঁকি দিতে চায় অজায়গায়।" [ল্যাবরেটরি, তিনসঙ্গী]

এভাবে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিভিন্ন রূপ ও রীতির মধ্যে দিয়ে বাংলা গদ্যভাষা আজকের পরিশীলিত রূপ লাভ করেছে। ছোটগল্পের আঙ্গিকে ডিটেইলিঙয়ের এক চূড়ান্ত উদাহরণ দেবেশ রায়ের 'দুপুর' গল্পটি— "অনেক ছেলের মা, শিথিল দেহ, শ্লথ যৌবন নারীর মতো দুপুরটা হাঁফসাচ্ছে। একটা মাদী কুকুরের মতো দুপুরটা পড়ে আছে জিভ আর দু পাশের দুটো ছুঁচলো দাঁত বার করে। যতীনবাবু চোখ বুঁজে পড়ে আছেন চিত হয়ে। তিনি ছাড়া সবাই যেন ঘুমে অচেতন। এ ঘরে রেণুবালা আর মুকুল, ও' ঘরে মায়া, বারান্দায় সতী। মরার পরও চৈতন্য থাকলে চিতার আগুনে তপ্ত হতে, আগুন হতে ও অঙ্গার হতে যেমন লাগতো যতীনবাবুর যেন তেমনি লাগছে। তিনি অপেক্ষা করে আছেন আগুন হয়ে জ্বলতে জ্বলতে কখন তিনি অঙ্গার হবেন, তারপর নদী থেকে মাটিরকলসিতে জল এনে, ঢেলে তাকে নিশ্চিহ্ন করা হবে। মাটির কলসি করে বয়ে আনা জলে লুপ্ত হবার ইচ্ছায় সারা শরীরটা জ্বলছে যতীনবাবুর। আর এই প্রজ্বলন্ত মানুষটির দিকে তাকিয়ে বসে আছে দুপুর, এই শ্লথ যৌবন দুপুর।"

কিংবা দেখা যেতে পারে কমলকুমারের 'সুহাসিনীর পমেটম' উপন্যাসের একটি পরিচ্ছেদের কিছুটা অংশ "সৌন্দর্য্যবর্তী বালিকার ওষ্ঠে সূক্ষ্ম কম্পন, নাসা স্ফীত, ক্রমে ধীরে আস্তে আস্তে তাহারই উন্নত সৌখীন গ্রীবা শিল্পীসমাজ অবধারিত রসিকজন সমাদৃত যথার্থ সুলিখিত বিচিত্র বক্ররেখা, যাহা অদৃশ্য, ধরিয়া উঠিয়া জাগ্রত, লখাই-এর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি, লখাই-এর প্রশংসা তাহাকে এমত একগাম্ভীর্য্য মধ্যে আনীত করে যে সেখানে সে সুহা চিরকাল।" গদ্যের এই চমৎকারিত্যই বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটি ছোটগল্পের প্রস্তাবনা দেখে নেওয়া যেতে পারে "আমাদের নিবারণ কর্মকার ছিলেন আঁকিয়ে মানুষ। লোকে বলত বটে পটুয়া নিবারণ, কিন্তু তার ছবি-টবি কেউ কিছু বুঝত না। সেই অর্থে পট-টট কখনও আঁকেননি নিবারণ কর্মকার। যদিও ঠিক পটুয়া ছিলেন না নিবারণ, তা তাঁর আঁকার ধরনধারণ ছিল অনেকটা পটুয়াদের মতো তুলির টান, রঙের মিশ্রণ সব কিছুই ছিল সেই পুরনো ধরনের। শুধু বিষয়বস্তুতেই তাঁর নতুনত্ব কিংবা মতান্তরে নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়ত। আমি তাঁর আঁকা একখানা বাঘের ছবি দেখেছিলাম যার পেটটা ছিল কাচের মতো স্বচ্ছ, আর সেই পেটের ভিতরে দেখা যাচ্ছে একটি গর্ভবতী মেয়ে শুয়ে আছে মেয়েটি ও ভ্রূণ এই দুজনের মুখেই নির্লিপ্ত নির্বিকার হাসি। সব মিলিয়ে দেখলে কিন্তু বাঘটার জন্যই দুঃখ হয়। তাঁর গোঁফ ঝুলে গেছে অকালবার্ধক্যে, তার চোখ কোটরগত ও হিংস্রতাপূর্ণ। ছবির নীচে লেখা 'গর্ভবতী নারীকে ভক্ষণ করিয়াছ, এখন কেমন মজা?"

কিংবা তার অন্য একটি গল্পে "লোকটা গরীব, বুঝলেন! খুব গরীব।যাচ্ছেতাই রকমের গরীব মশাই, বিচ্ছিরি রকমের গরীব। আসলে টাকা ছাড়া লোকটার আর কিছুই নেই।" ভাষার এই শক্তি ও সামর্থ্য বাংলা গদ্য ভাষার ঐশ্বর্য্য।

৪০৫.২.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। গদ্যভাষা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে তা উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

২। গদ্যভাষা কি পদ্যভাষার বিপরীত? বাংলা সাহিত্য থেকে বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে গদ্য ভাষার ক্রমবিকশিত রূপটি নির্মাণ করো।

৩। মানুষের মুখের ভাষায় গদ্য কতটা বিবর্তিত হয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করে গদ্য ও পদ্য ভাষার মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করো।

৪০৫.২.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'বহুরূপে ভাষা' (তৃতীয় খণ্ড), ২০১৬, প্রতিভাস, কলকাতা

২। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে' (২০১৩), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', (২০২২), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক-৫

‘মেয়েলি ভাষা’

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.২.৫.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.২.৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.২.৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.২.৫.১ : মুখবন্ধ

ভাষা সবসময় পরিবর্তনশীল। হাজার বছরের জারিকৃত পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা আর তার নিরিখে নির্মিত ভাষা দাঁড়িয়ে থাকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিতের ওপরে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত বহু শব্দ বা শব্দগুচ্ছ আছে, যেগুলোকে ব্যাকরণ কিংবা ভাষাতত্ত্বের নিয়মের নিগড়ে বেঁধে রাখা যায় না। এই ভাষাজ্ঞান আমরা অর্জন করে থাকি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বোধ থেকে। সিমোন দ্য বেভোয়া বলেছিলেন, মেয়েরা জন্ম থেকেই ‘নারী’ হয়ে ওঠে না। যে সামাজিক ও পারিবারিক জীবন সে পায় তার থেকেই তার মেয়ে— জন্ম লাভ হয়। অর্থাৎ যে যেমন যাপন করে, সে তাই পায়। ভাষাবোধের এই সংস্কৃতিতে ভাষা হয়ে পড়েছে লিঙ্গবিভাজিত— হয়ে পড়েছে নারীর ভাষা, পুরুষের ভাষা।

এই ভাষার ব্যবহারে মেয়েদের নিজস্ব কিছু কোড ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। এই কোড-এ কথা তারা একেবারে নিজেদের মধ্যে বলে থাকে। এ মেয়েদের নিজস্ব ভাষা। যেমন— একটি মেয়ে আর একটি মেয়েকে যখন বলে তার ‘শরীর খারাপ’ হয়েছে, তার মানে তার পিরিয়ড হয়েছে। এ রকম আরও একটি শব্দ হল ‘বয়ে গেছে’। কোনও পুরুষের মুখে এই জাতীয় শব্দ শোনা যায় না। আবার গ্রাম বাংলার মেয়েদের কিছু বাচনিক নিষিদ্ধতা আছে। আহারের জন্যে বয়স্ক পুরুষকে আহ্বান করতে হলে এরা সরাসরি খেতে আসার কথা বলেন না, বলেন ‘আইস’। এদের সংস্কার, সরাসরি ভাত খেতে আসার কথা বললে সকলেই তা বুঝতে পারে। এমনকি প্রেতাত্মারা

পর্যন্ত সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভোজনে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। স্বামী বা গুরুজনের নাম এনারা মুখে আনেন না। শুধু তাই নয়, ঐ নামের সাদৃশ্য বা সমোচ্চারসম্পন্ন শব্দ পর্যন্ত এরা উচ্চারণ করেন না। এ ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিকে প্রকৃত নামের পরিবর্তে প্রতিশব্দস্থানীয় কোনও শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে চিহ্নিত করা হয়। যেমন— স্বামীর নাম যদি কালুয়া বা কালাচাঁদ হয় তবে স্ত্রী তার নামকরণে ময়লা বা ময়লাচাঁদ ব্যবহার করে। 'ময়লা' অর্থে কালো। এছাড়াও গ্রাম বাংলার মহিলারা স্বামী সম্বোধনের জন্যে 'এই', 'গে', 'হে' ব্যবহার করেন। তবে ভাসুর অসম্বোধিত, বিশেষ প্রয়োজনে দাদা।

মেয়েলি ভাষার একটি বিশিষ্ট আশ্রয় শিশুদের ডাকনামগুলো। শৈশবে শিশুরা মেয়েমহলে অর্থাৎ মা, মাসি, দিদিমা, ঠাকুমার কাছেই বেশি সময় কাটায়। তাই তাদের নামকরণে বিশেষত আটপৌরে ডাকনামগুলোতে মেয়েদেরই কর্তৃত্ব লক্ষ করা যায়। এইসব আটপৌরে নামগুলোতে মেয়েদের বিচিত্র প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গি, সংস্কার ও পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাই দেখা যায়, নামকরণে জাতক-জাতিকার জন্মকাল, জন্মবার, জন্মকালীন প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদির স্মৃতি রক্ষিত থাকে। যেমন— দেবারু (পুং)-দেবারী (স্ত্রী) [রবিবারে জন্ম]; মংলু (পুং)-মুংলী (স্ত্রী) [মঙ্গলবারে জন্ম]; বাদল [প্রবল বর্ষায় জন্ম] ইত্যাদি।

বাংলাদেশের মেয়েলি ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য, কথায় কথায় প্রবাদ-প্রবচন ও ইডিয়মের সুপ্রচুর ব্যবহার। এগুলো অবশ্য পুরুষের ভাষাতেও আছে তা সত্ত্বেও নারীর ভাষাতেই এগুলির বাহুল্য। তবে বর্তমানে আধুনিক কালের শিক্ষাদীক্ষা মেয়েদের প্রকাশ ক্ষমতাকে নানাভাবে প্রসারিত ও সমৃদ্ধ করেছে। তাই কথায় কথায় এখন আর তারা প্রবাদের আশ্রয় নেয় না। কিন্তু আঞ্চলিক মেয়েলি ভাষার একটা বড় পরিচয় নিহিত আছে মেয়েলি প্রবাদ বাক্যগুলিতে। বিশ্লেষণের বিশেষ প্রয়োজন নেই, চলিত বাংলায় প্রবাদগুলি রূপান্তর করে দিলে সহজেই মেয়েলি ভাষার কৌতুক প্রবণতা, পরিহাসপটুতা, সামাজিক নিরীক্ষণভঙ্গি এবং সর্বোপরি এদের বাচনভঙ্গির একটা সংহত পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—

i) লাটাই গুণে ফেটি, মাও গুণে বেটী।
[চরকার গুণে সুতো ভালো হয়, মায়ের গুণে মেয়ে]

ii) ওদোলের বোদোল, শুকটা দিলে শিদোল।
[যেমন কর্ম তেমন ফল]

iii) সুকটি না ছাড়ে গং, হলদী না ছাড়ে অং।
[শুটকী মাছের গন্ধ যায় না, হলুদের রং ছাড়ে না]

iv) হাড়িক না দেখাই বাড়ি, গুণ্ডীক না দেখাই খাঁড়ি।
[বিত্তহীনকে বিত্তবানের বাড়ি দেখাতে নেই, ধীবরকে দেখাতে নেই মৎস্যবহুল জলাশয়]

এইসব প্রবাদ-প্রবচন ছাড়াও বিভিন্ন ধাঁধা, ছড়া ও গানে গ্রাম বাংলার মেয়েদের রসনার রস তথা বাকসৌন্দর্য সঞ্চিত আছে। এই বিচিত্র বাক্সিদ্ধি মেয়েদের প্রায় একচেটিয়া। কোথাও কোথাও তা অবশ্য পুরুষের উক্তিতেও সঞ্চারিত হয়েছে।

আজকের নাগরিক জীবনে মেয়েদের অবস্থান বদলে দিয়েছে তাদের ভাষাপ্রকৃতিকে। আশাপূর্ণা থেকে তিলোত্তমা, বাণী বসু থেকে তৃষ্ণা বসাক— বদল এসেছে লেখার ভাব, ভাষা এবং ভঙ্গিতে। মেয়েলি লেখকদের

লেখাতে মূলত যে বিষয়টি নজর কাড়ে সেটি হল সাংসারিক নানান জটিল বুনন। তাঁরা নারীচরিত্রের অন্তর্লোকে আলো ফেলেন। আশাপূর্ণা দেবীর লেখা থেকে সমকালীন বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়েদের অবস্থান জানা যায়, যেমন তেমনই সামাজিক প্রেক্ষিতে নারীর গুরুত্ব কতখানি তাও উঠে আসে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের গতিবিধির ক্ষেত্র বেড়েছে। প্রায় সব জীবিকাতে এখন মেয়েদের অনায়াস প্রাধান্য। আর সেই বিস্তৃত ক্ষেত্রটি পরবর্তীকালের মহিলা লেখকদের কলমে দেখা গেছে। যার মধ্যে দিয়ে মেয়েলি ভাষা তথা মেয়েদের বাচনভঙ্গিটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নবনীতা দেবসেনের লেখার বড় অংশ জুড়ে আছে নারী। অধিকাংশ নারীই মধ্যবিত্ত শ্রেণির। তারা একদিকে আজন্মলালিত সংস্কারকে আঁকড়ে থেকেছে। আবার সেই সংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে উত্তরণের পথ খুঁজছে। 'গদাধরপুর উইমেন্স কলেজ'-এর কথককে আমরা বলতে শুনি—

"আমি তো একটা ফাউ। কর্তা বোধহয় টেরও পাবেন না মেমসাহেব কলকাতা মে, ইয়া গদাধরপুর মে—শোন, সত্যি রে, ফিলসফিতে একটা চান্স হয় না তোদের গদাধরপুর উইমেন্স কলেজে?"

একই ভাবে লীলা মজুমদারের লেখনীর মধ্যে দিয়েও মেয়েদের অবস্থানটিকে চিহ্নিত করা যায়। মেয়ে-চাকরেদের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

"রোজ চার-পাঁচটা ট্রামগাড়ির আধখানা বোঝাই করে যাওয়া-আসা করে তখন অবিশ্যি গুঞ্জনমুখরিত মেয়ে-গাড়ি ছিল না, সাধারণ গাড়িতে গোটা চারেক মেয়েদের সিট থাকত। সেখান থেকে বড় জোর পুরুষ কণ্ঠের খ্যাঁকখ্যাঁক শব্দ কানে আসত।"

আবার সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে কবিদের ভাষাও তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়েছে। কোমল রেখা থেকে কবিতা এসেছে কঠোর বাস্তবে। ভাষাই তো এই দিন বদলের একমাত্র মাধ্যম। যা আমাদের জানিয়ে দেয় দিনকালের পাল্টানোর খবর। কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের কলমে পাই"আপনি বলুন মার্কস, শ্রম কাকে বলে!/গৃহশ্রমে মজুরী হয় না বলে মেয়েগুলি শুধু/ঘরে বসে বিপ্লবীর ভাত রেঁধে দেবে/আপনি বলুন মার্কস,/ মেয়েরা কি বিপ্লবের সেবাদাসী হবে?"

ভাষা সংযোগের মাধ্যম। সবসময়ই যে সেই সংযোগ ভার্বাল হবে এমনটা নয়। অনেক সময় মুখে কিছু না বলে, অনেক কিছু বলার যে ভাষা তা কিন্তু মেয়েদেরই একচেটিয়া। নীরব থেকেও যে অজস্র অনুভূতি প্রকাশ করা যায়, সেটা মেয়েরাই পারে। এমনকি তাকানোর মধ্যে দিয়ে তারা রাগ, দুঃখ, আনন্দ প্রকাশ করতে সক্ষম। প্রায় সমস্ত বিখ্যাত অভিনেত্রীর বিলোল কটাক্ষের হাতছানি পাননি, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। চোখের ভাষাও যে কমিউনিকেশনের মাধ্যম হতে পারে তা কেবল মেয়েরাই সম্ভব করতে পারে। মহারানি ক্লিওপ্রেট্রা থেকে রাজিয়া সুলতানা প্রায় সবখানেই এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। এ মেয়েদের অনন্যতার কাহিনি। ভাষা এখানে শক্তিশালী ও ক্ষমতার উৎস। আর এখানেই মেয়েলি ভাষার বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা।

৪০৫.২.৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। দৈনন্দিন জীবনে ও সাহিত্যে ব্যবহৃত মেয়েলি ভাষার পরিচয় দিয়ে উভয়ের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করো।

২। মেয়েদের নিজস্ব ভাষা জগৎ কীভাবে তৈরি হয়? এই ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৩। মেয়েদের ভাষাকে হেঁয়ালি ভাষা বলা হয় কেন? মেয়েলি ভাষায় ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনগুলি সম্পর্কে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

৪০৫.২.৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'বহুরূপে ভাষা' (পঞ্চম খণ্ড), ২০১৯, প্রতিভাস, কলকাতা

২। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে' (২০১৩), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', (২০২২), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ২

একক-৬

‘ক্যাম্পাসের ভাষা’

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.২.৬.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.২.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.২.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.২.৫.১ : মুখবন্ধ

ক্যাম্পাস মানে এক ঝাঁক তরুণ-তরুণীর স্বপ্নলোক, ভবিষ্যৎ, জীবনের ওঠাপড়া, ভাঙাগড়া, স্বপ্ন সত্যি হওয়া, হতাশার অতলে তলিয়ে যাওয়া, উন্নতির চরম শিখরে ওঠার আঁতুড় ঘর। রাজনীতির প্রথম পাঠ, প্রেমের সূতিকাগৃহ। ক্যাম্পাস মানে রোদ ঝলমলে সকাল, আবার মন খারাপ করা বিকেল। ক্লান্ত সন্ধে, অবসন্ন রাত্রি। ক্যাম্পাসের আধিক্যের মতো তার প্রকৃতিও আলাদা আলাদা। কলকাতার সাধারণ ডিগ্রি কলেজ, সরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জেলা ও মফস্‌সলের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিটি ক্যাম্পাসের চরিত্র আলাদা আলাদা। আর এই চরিত্রের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি হয় ক্যাম্পাসের ভাষা।

পরস্পরকে বোকা বা নির্বোধ বলা যে কোনও ক্যাম্পাসের একটি সাধারণ লক্ষ্য। বোকা বা নির্বোধ বোঝাতে কীরকম শব্দ ব্যবহার করা হয় তার একটা তালিকা তৈরি করা যাক ‘অগা’, ‘অঘা’, ‘আতাক্যালানে’, ‘আদমা’, ‘উদো’, ‘ক্যাবলাকান্ত’, ‘জগা’, ‘টিউবলাইট’ ইত্যাদি। আবার ক্যাম্পাসে সুন্দরী বোঝাতে নানারকম শব্দ উড়ে বেড়ায়। যেমন ‘চুলবুলি’, ‘ছেনকি’, ‘ছিপলি’, ‘গাপলি’, ‘ডাঁসা’, ‘ডবকা’ ইত্যাদি।

ক্যাম্পাসগুলোতে দেখা যায়, ঐতিহ্য মেনেই সেখানে মস্তানির পাঠ চলে। তাই মারপিট এখানে কোনও ঘটনাই নয়। কিন্তু মারপিট বোঝাতে যে শব্দগুলি ব্যবহার করা হয় তা বেশ চিত্তাকর্ষক। প্যাঁদান, রামপ্যাঁদান, ক্যালান, থোবড়া বিলা করে দেওয়া, মুখের জিওগ্রাফি বদলে দেওয়া, উদোম ক্যালানো, দু-চারটে ঝেড়ে দেওয়া, এক পাঞ্চ দেওয়া,

এক ঠুসো দেওয়া, বাপের নাম খগেন, হিসেব বরাবর প্রভৃতি। মারপিট হল ফলাফল, আর এর প্রস্তুতি হল ঝামেলা। এবার ঝামেলার ওপর একবার চোখ বোলানো যাক 'কিচাইন', 'হ্যাপা', 'হ্যাংগাম', 'বাওয়াল', 'লাফড়া' প্রভৃতি। এই 'লাফড়া' সামলানোর জন্য তারা 'সাল্টে নেওয়া' শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করে থাকে। এই লাফড়া সৃষ্টির নানা কারণ থাকলেও নেশা লাফড়া সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। এই ক্যাম্পাসে নেশা সংক্রান্ত তথ্যের আদানপ্রদানের জন্য যে শব্দগুলো শোনা যায় তা হল 'মাল', 'বাংলা', 'টান্টু', 'চুল্লু' ইত্যাদি তারা তরল পানীয় তথা মদ বোঝাতে ব্যবহার করে। আবার গঞ্জিকা বোঝাতে 'শুকনো', 'লুসিয়া', 'পুরিয়া', 'ব্যোমভোলে' ইত্যাদি। 'হেরোইন' বোঝাতে পাতা আর যারা পাতা খায়, তাদের বলা হয় 'পাতাখোর'। দুরকম নেশা বোঝাতে 'শুকনো' ও 'ভেজা' (গাঁজা ও মদ) ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এখন ছাত্রছাত্রী যারা গঞ্জিকা সেবন করে তারা মূলত সিগারেটের মধ্যে গাঁজাভরে সেবন করে। তাই ক্যাম্পাসে যখন কানে আসে, 'ভরা আছে', 'করেছিস', 'বানানো আছে', 'বানিয়েছিস' তখন এর অর্থ আলাদা। আর নেশার ঘোর বোঝাতে 'ধুনকি' শব্দের জুড়ি মেলা ভার। ক্যাম্পাসগুলোতে সিদ্ধি ও ভাঙের চল কম বলেই হয়তো এর প্রতিশব্দও কম। ধূমপান একটি স্বাভাবিক ঘটনা ক্যাম্পাসে। এর সঙ্গে জড়িত কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন 'সাদাকাঠি' (সিগারেট), 'কাউন্টার দেওয়া নেওয়া', 'লাস্ট টান' ইত্যাদি।

এবার ক্যাম্পাসে কত রকম 'বাজি' আছে একটু দেখা যেতে পারে। যেমন 'ঠেকবাজি', 'ইউনিয়নবাজি', 'পার্টিবাজি', 'গ্রুপবাজি', 'ঢপবাজি', 'মেয়েবাজি', 'চালবাজি' ইত্যাদি। সহপাঠীদের মধ্যে কেউ কেউ কাকা, মামা, ভাই, ভাইপো হিসেবে চিহ্নিত হয়। যার সঙ্গে চিরাচরিত পারিবারিক যোগের কোনও সম্পর্ক নেই। আবার ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সকলের সকলকে 'ভাই' বলে সম্বোধন ক্যাম্পাসগুলিতে শোনা যায়। এলেবেলে বোঝাতে 'দুদুভাতু', 'নেকুপুষু', 'কচুমানা', 'বাপের লালু ছেলে' ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। আবার কায়দা বোঝাতে 'নকশা', 'ভাঁজ', 'ক্যারদানি', 'পেঁয়াজি', 'গাঁড়পেঁয়াজি' আকছার শোনা যায়। যেমন 'পেঁয়াজি মেরো না', 'গাঁড়াপেঁয়াজি ছাড় তো', 'আব্বে নকশা মারিস না', 'নকশা ছাড়', 'নাটক করিস না' ইত্যাদি। আগে আমরা 'গুমোর', 'পায়াভারী', 'অহংকারী' প্রভৃতি শব্দগুলো শুনতে পেতাম। এখন ক্যাম্পাসে এই অর্থ বোঝাতে বলা হয় 'খুব তেল হয়েছে', 'খুব চর্বি হয়েছে' ইত্যাদি। গোপন করা অর্থে বলে 'চাপলুসি'। বাড়াবাড়ি অর্থে 'চুদুরবুদুর' বা 'চুদুরমুদুর'। বসে যাওয়া অর্থে 'শান্টিং'। উস্কানি অর্থে 'পিন দেওয়া', উপদেশ অর্থে 'পিনিক মারা', মেয়েদের পিছনে লাগা অর্থে 'ঝারি মারা', সমস্যা বোঝাতে 'পেছন ফাটছে', খুশি অর্থে 'বিন্দাস', কোনও কিছুতে জোর দেওয়া অর্থে 'হ্যাবক', 'হেবভি' ইত্যাদি চলে। আবার হস্তমৈথুন বোঝাতে 'হাত মারা', অস্বাভাবিক বোঝাতে 'হাওড়া' (স্টেশন নয়), আজেবাজে কথা অর্থে 'হক্তাবক্তা', ইতস্তত অর্থে 'ইকরবিকর', ফূর্তিসহ বোঝাতে 'আহিলদিহিল', রসিক বন্ধু বোঝাতে 'অশিয়া', হাসি অর্থে 'খিল্লি', দাম বাড়ানো এখন হয়েছে 'ভাও বাড়ানো', আবার মৃত্যু অর্থে 'ছবি' প্রভৃতি শব্দ তারা খুবই অনায়াসে ব্যবহার করে। যে কোনও বাক্যের আগে বা পরে পুরুষাঙ্গের নানা প্রতিশব্দ অবলীলায় ক্যাম্পাসে ছেলেরা ব্যবহার করে থাকে। যেমন 'বাঁড়া', 'ল্যাওড়া', আবার বেশি জোর দেওয়ার জন্য বলে 'ধুর ল্যাওড়া'। যেন এগুলি না থাকলে বাক্যটি ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ। আবার কলেজ ক্যাম্পাসের নিজস্ব প্রতিবাদের ভাষাও রয়েছে। যেমন—'হোক কলরব'।

মেডিকেল কলেজগুলোর ক্যাম্পাসে প্রচলিত ভাষা বা শব্দবন্ধ আবার আলাদা। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মারা গেছে বোঝাতে 'মালটা টেঁসে গেছে', ওষুধ কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি অর্থে 'বেচুবাবু' বা 'বেচু', অন্য হাসপাতালে স্থানান্তর বোঝাতে 'রেফার', রোগী দেখা অর্থে 'রাউন্ড' ইত্যাদি প্রচলিত। তথ্য প্রযুক্তির বিস্তারের ফলে ক্যাম্পাসের ভাষায় যে পরিবর্তনগুলি দেখা যায় তা হল এক সময় কলেজ ক্যাম্পাসে 'জিবি' বললে

শুধু 'গর্ভনিং বডি' বোঝাত, এখন 'গিগাবাইট' বোঝায়। আগে দেওয়াল লিখন (ওয়ালিং), পোস্টারিং হত, এখন 'ওয়াল' মানে 'ভারচুয়াল দেওয়াল'। পোস্ট করা মানে ছাত্রছাত্রীর চিঠি পাঠানো বোঝায় না। বোঝায় ফেসবুকে কিছু লেখা।

কলেজ ক্যাম্পাসের আড্ডায় সিনেমার আলোচনা সেই কোন যুগ থেকে চলে আসছে। উত্তম কুমার হয়ে হৃতিক রোশন অথবা হাল আমলের আয়ুষ্মান খুরানা বা ভিকি কৌশল-কলেজ আড্ডায় 'হার্টথ্রব'রা সব সময়ই 'ইন'। কিন্তু বর্তমান জেনারেশন এখন বলিউড হিরোদের চেয়ে 'সেক্রেড গেমস'-এর সইফ আলি খান বা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকির অভিনয় নিয়ে একটু বেশি আলোচনায় আগ্রহী। সিনেমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে ক্যাম্পাসের ভাষাও। ক্যাম্পাসের ভাষা অত্যাধুনিক ভাষাচর্চার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৪০৫.২.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। তথ্যপ্রযুক্তি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে ক্যাম্পাসের ভাষা বদলে গেছে তা উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

২। ক্যাম্পাসের ভাষা বলতে কী বোঝ? কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এর বিশিষ্ট প্রয়োগ উল্লেখ করো।

৩। ক্যাম্পাসের ভাষা মানেই কি অশ্লীল? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

৪০৫.২.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'বহুরূপে ভাষা' (তৃতীয় খণ্ড), ২০১৬, প্রতিভাস, কলকাতা

২। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে' (২০১৩), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', (২০২২), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক-১

'সম্ভাষণের ভাষা'

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.৩.১.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.৩.১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.৩.১.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.৩.১.১ : মুখবন্ধ

সৌজন্য প্রকাশের একটি অঙ্গ হল সম্ভাষণ। সমাজের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা থেকেই সৌজন্যসূচক ভাষার সঞ্জনন। তাই লি ওয়েই বলেন, "appropriate greeting behaviour is crucial for the establishment and maintenance of interpersonal relationship." অর্থাৎ সম্ভাষণের ভাষা প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন হয় দুই বা ততোধিক ব্যক্তির। এ ধরনের সম্ভাষণ যেমন একই ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ঘটতে পারে তেমনি আবার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষও অংশ নিতে পারে সম্ভাষণসূচক বাকপ্রক্রিয়ায়। সম্ভাষণের ভাষার বেশ কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হল—

প্রথমত, সম্ভাষণের ভাষা কেবল অন্যকে স্বাগত জানানোর জন্যই ব্যবহৃত হয় না, অতিথিকে বিদায় দেবার মুহূর্তেও ঘটতে পারে এর প্রয়োগ। যেহেতু, আমাদের ভারতীয় সমাজে বিদায়ের মধ্যে ভবিষ্যতের আমন্ত্রণ বার্তা নিহিত থাকে।

দ্বিতীয়ত, সম্ভাষণের ভাষাছাঁদ নির্ভর করে সমাজ-সংগঠনের স্তরবিন্যাসের উপর। যেমন, কথোপকথনের ক্ষেত্রে দুটো ভিন্ন মর্যাদা বা ভিন্ন বয়সের মানুষ কিংবা পুরুষ ও নারীর সম্ভাষণের ভাষা ও ভঙ্গি কিছুটা বদলে যেতে পারে। আবার সংস্কৃতি ভেদেও আলাদা হয়ে যেতে পারে এই ছাঁদ।

তৃতীয়ত, সম্ভাষণের ভাষা যে কেবল বাচনিক তা নয়। অবাচনিক ভঙ্গির মাধ্যমেও তার প্রকাশ ঘটতে পারে। আবার স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বাচনিক প্রকাশ ও ভঙ্গি মিলিয়ে গড়ে ওঠে এক মিশ্র ছাঁদ।

চতুর্থত, সম্ভাষণসূচক ভাষায় আমাদের আচরণবিধি বা মান্য আচার-অনুষ্ঠানের মতোই কথোপকথনে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে একটা পারস্পরিক প্রত্যাশা থেকে যায়। অর্থাৎ সম্ভাষক ভাষা যারা ব্যবহার করছে তাদের কাছে অন্য অংশগ্রাহীর তরফ থেকে একটি বিশেষ ভাষাছাঁদ মেনে চলবার প্রত্যাশা থেকে যায়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, যদি কেউ প্রশ্ন করে 'কেমন আছেন?', তবে বক্তার কাছে প্রত্যাশিত উত্তর, 'ভালো আছি।' এর অন্যথা হলে সংলাপের দিক থেকে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক স্তরের গূঢ় কোনও কারণ কাজ করছে বলে ধরে নিতে হয়।

সম্ভাষণের ভাষাছাঁদে সাধারণত প্রত্যাশিত উপাদান তিনটি। যথা—

এক.

যে কোনও সম্ভাষণসূচক কথোপকথনে সম্ভাষক রূপ প্রকৃতপক্ষে স্বজনসূচক শব্দ (kinship terms) বাংলা ভাষায় স্বজনসূচক শব্দের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমটি নমনীয়তা অর্থাৎ flexibility, দ্বিতীয়টি অন্যোন্যতা বা reciprocity. সমাজে স্বজনসূচক পদগুলি আমরা শুধুমাত্র স্বজনদের উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করি না, তা ব্যবহার করতেই পারি অনাত্মীয়, বন্ধু, পরিজন ও প্রতিবেশীর ক্ষেত্রেও। যিনি সম্পর্কে নিজের 'কাকা' বা 'দাদা' নন, তাকেও সম্ভাষণ জানাতে পারি এই ধরনের স্বজনসূচক শব্দ দিয়ে। একেই বলা যেতে পারে নমনীয়তা। আবার যাকে 'দাদা' বা 'দিদি' নামে সম্বোধন করছি, তিনিও বিপরীত দিক থেকে সম্ভাষককে একই নামে সম্বোধন করতে পারেন। তবে সব রকমের স্বজনসূচক শব্দের ক্ষেত্রে এ জাতীয় অন্যোন্যতা প্রযুক্ত নয়। সম্ভাষক রূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট অংশগ্রাহীর বয়স, পদমর্যাদা, সে পুরুষ নাকি মহিলা ইত্যাদি বিষয় গুরুত্ব পায়।

দুই.

সম্ভাষণে ব্যবহৃত ব্যক্তিবাচক সর্বনাম তুই, তুমি অথবা আপনি বিকল্প হিসেবে বেছে নেওয়া যায়। আরভিন-ট্রিপ নির্বাচনের এই ব্যাপারটিকে বিকল্প সূত্র নামক নিয়মের অধীনে আনতে চেয়েছেন। নির্বাচনের বিষয়টি নির্ভর করে পারস্পরিক অন্তরঙ্গতার মাত্রা, বয়স কিংবা সামাজিক মর্যাদার উপরে। আবার ব্রাউন এবং গিলম্যান ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত এসেছেন, নির্বাচনের বিষয়টি দুটো কারণের উপর নির্ভর করে। এক ক্ষমতা তাৎপর্য, দুই সংহতির তাৎপর্য। রুশ ভাষার আলোচনা প্রসঙ্গে পল ফ্রিডরিশ কারণগুলিকে দশটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। বাংলায় একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে সর্বনামের তিনটি মাত্রা চিহ্নিত করার জন্যে—তুই কোথায় যাচ্ছিস? (সম্মানসূচক), তুমি কোথায় যাচ্ছো? (নিরপেক্ষ), আপনি কোথায় যাচ্ছেন? (সম্মানসূচক)। এ ধরনের প্রয়োগ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। যাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করি, ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করলে চরম অসৌজন্যের প্রকাশ ঘটে। আবার যার সঙ্গে 'তুই' বা 'তুমি'-র সম্পর্ক, তাকে হঠাৎ 'আপনি' বলে সম্বোধন করলে কিছুটা অসৌজন্য বোধের পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়।

তিন.

মর্যাদা বা প্রতিপত্তির দিক থেকে যারা উঁচুতে কিংবা বয়সের দিক থেকে বড়, তাদের উদ্দেশ্যে আমরা ব্যবহার করি 'বাবু', 'মশাই' ইত্যাদি। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে 'দেবী' ব্যবহৃত হয়। লেখার ভাষায় 'শ্রীযুক্ত', 'শ্রীদেবী' নামের প্রথমে প্রয়োগ করা বিনম্র সম্ভাষণের সূচক। আবার বিদেশি ভাষা থেকে ধার করা 'স্যার', 'ম্যাডাম'-ও সৌজন্য প্রকাশক। দৃষ্টান্তস্বরূপ : রামবাবু কোথায় চললেন? মশায়ের বাড়ি কোথায়? শ্রীদেবী আপনাকে ধন্যবাদ জানাই ইত্যাদি।

সম্ভাষণের ভাষার ক্ষেত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ দেখা যায়। যেমন—মিশ্র ধর্ম, প্রথানির্ভরতা ও সূচক ধর্ম।

মিশ্র ধর্ম : সম্ভাষণের ভাষা প্রকৃতপক্ষে সংযোগী ভাষা। একজনের সঙ্গে অন্যজনের সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটলে সৌজন্যসূচক সম্ভাষণ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। ব্যক্তি বনাম ব্যক্তির এই সংজ্ঞাপনে, উক্তি-প্রত্যুক্তির সচল বিনিময়ে ভঙ্গি এবং বেশ কিছু অতিভাষিক বৈশিষ্ট্যও (যেমন কাটা কাটা অথবা টেনে কথা বলা কিংবা কণ্ঠস্বরের উচ্চাবচতা) সম্পৃক্ত হতে থাকে। ফলে সম্ভাষক বিনিময়ে বাচিক ও অবাচিক লক্ষণের সমন্বয়ে এক ধরনের মিশ্রছাঁদ তৈরি হয়ে যায়।

তাই মেহেরোত্রা জানিয়েছেন যে, যে কোনও সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের আদবকায়দাই হল বাচিক বিবৃতি এবং একইসঙ্গে ভঙ্গি ও অতিভাষিক সংযুক্তির সমাহার। ম্যালিনোস্কি এবং গফম্যান তাই বলেন সম্ভাষণের বিনিময়ে বাচনিক উক্তির সহচর হিসেবে অনিবার্য হয়ে উঠতে পারে অবাচনিক ক্রিয়াকলাপ। হতে পারে তা ব্যক্ত অথবা নিহিত। হাত জোড় করা, মাথা নাড়া, মৃদু হাসা, আলিঙ্গন ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, একজন হিন্দিভাষী যখন বলে, 'নমস্তে' তখন এই বলার মধ্যে নিহিত থাকে অন্যের পা স্পর্শ করে বা নত হয়ে সম্মান জানানোর অভ্যস্ত ভঙ্গিটি। আবার বাঙালি যখন অন্যকে নমস্কার জানায়, তখন হাত জোড় করার পাশাপাশি মৃদু হাসি, ঘাড় নাড়া প্রভৃতির ব্যক্ত ভঙ্গির প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথানির্ভরতা : সম্ভাষণের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রথানুগত্য। একে অন্যকে সৌজন্য জানানোর যে সম্ভাষক ভাষা ব্যবহার করি, প্রায় ক্ষেত্রেই তা অপরিবর্তনীয়। সৌজন্যসূচক প্রশ্নেও বাঁধা জবাব প্রত্যাশিত হয়ে ওঠে। ছোটখাটো শব্দের পরিবর্তন কিংবা অবিভাজ্য ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের তারতম্যও এক্ষেত্রে অনুমোদিত নয়। প্রকৃতপক্ষে সৌজন্যসূচক সম্ভাষণ এক সুদক্ষ প্রকৌশল। যার সতর্ক ও নির্বাচিত প্রয়োগ পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। সৌজন্যমূলক জ্ঞাপনে তথ্য সেভাবে উপস্থিত থাকে না। তাই ধরে নেওয়া যায়, সম্ভাষণের ভাষায় তথ্য বিনিময় এর মূল্যবান প্রায় শূন্য।

সূচক ধর্ম : সম্ভাষণের সূচক ধর্ম কোনও ভাষা সম্প্রদায়ের সমাজ মনস্তত্ত্ব, ধর্মীয় ভাবাবেগ, জাতীয় লক্ষণ, সংস্কার ও বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয় চিহ্নিত করতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সম্ভাষক উক্তি প্রায়শই সৌজন্য সাক্ষাতের সময়টিকে চিহ্নিত করে। ধরে নেওয়া হয়, সাক্ষাতের ক্ষণটি মাঙ্গলিক এবং শুভ লক্ষণ যুক্ত। ইংরেজরা, তাই পারস্পরিক সৌজন্য বিনিময়ে ব্যবহার করে good morning—good afternoon—good-night ইত্যাদি শব্দ। জাপানি বা চিনাদের সম্ভাষণে সময়ের দ্যোতনা থাকলেও 'শুভসূচক' বিশেষণের উল্লেখ সাধারণত থাকে না। বৈপরীত্য দেখি হিন্দিভাষী ও বাঙালিদের ক্ষেত্রেও। বাঙালিরা যখন শুভ সন্ধ্যা, সুপ্রভাত ইত্যাদি উচ্চারণ করে তখন তা ইংরেজি থেকে অনূদিত ঋণ।

বাংলায় সাধারণত তিন ধরনের সম্ভাষণ আছে। যেমন—বিনিময়সূচক, সম্মানসূচক ও প্রায়ভাষিক।

বিনিময়সূচক (Interactive) :

পারস্পরিক সৌজন্য বিনিময়ের সম্ভাষণে প্রশ্ন-উত্তরের একটা ছাঁদ থাকলেও প্রশ্নগুলো নিতান্তই সৌজন্যমূলক। যথার্থ প্রশ্ন নয়। প্রশ্নের উত্তর না দিয়েও সম্ভাষিত পালটা প্রশ্ন করতে পারে কিংবা প্রশ্নের উত্তর দেয় প্রত্যাশিত ছকে। উদাহরণস্বরূপ :

ক. কেমন আছেন? ভালো।

খ. কেমন আছেন? আরে! আপনার খবর কী বলুন?

এ ধরনের বিনিময় ঠিক আনুষ্ঠানিক নয় বরং ঘরোয়া এবং ঘনিষ্ঠতাসূচক।

সম্মানসূচক (Regards) :

এ ধরনের সম্ভাষণে সম্ভাষক সম্ভাষীদের সম্মান প্রদর্শন করে বিশেষ কিছু সম্মানসূচক পদ ব্যবহারের মাধ্যমে—

ক. মহাশয়ের বাড়ি কোথায় জানতে পারি কি?

খ. নমস্কার, কেমন আছেন?

প্রায়ভাষিক (Paralinguistic) :

সম্ভাষণ এক্ষেত্রে ভঙ্গি এবং প্রায়ভাষিক বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে। আমরা আগেই বলেছি বিস্তৃতভাবে দেখতে গেলে সম্ভাষণের ভাষা দু'ধরনের। বাচনিক ও অবাচনিক। সম্ভাষক উক্তির অনুষঙ্গরূপে ভঙ্গির আদান-প্রদান চলতেই পারে ('নমস্কার' বলার সময় 'হাতজোড়' করা)। হাইমজের মতে, শ্রদ্ধার সম্পর্ক যেখানে সেখানে সম্ভাষণের প্রয়োজনে উক্তির প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে উক্তির প্রয়োগ না করেও অবাচনিক ভঙ্গি দিয়ে সৌজন্য প্রকাশ করা যেতেই পারে। যেমন—আলিঙ্গন, করমর্দন, পায়ে হাত দেওয়া ইত্যাদি।

সম্ভাষণ নিছক প্রথা মেনে সৌজন্যের আদান-প্রদান নয়। সম্ভাষণসূচক ভাষা কেবল সম্ভাষিতকে শ্রদ্ধা বা সম্মানজ্ঞাপনের জন্যও ব্যবহৃত হয় না, তার অন্য কিছু নিহিত উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। যেমন—সম্ভাষিতের কাছ থেকে কিছু সুবিধা বা সুযোগ আদায়, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ক্ষমা , প্রার্থনা বা দুঃখ প্রকাশ অথবা সৌজন্যসূচক বন্ধন গড়ে তোলা। সময়ের পরিবর্তনে বদলে যায় সম্ভাষণের ভাষা ও ভঙ্গির বিশিষ্ট ছাঁদটি। এমনকি প্রচলিত আদব-কায়দার রীতিনীতি। সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভাষণের বৈচিত্র অনুধাবনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যা বিশ্লেষণ করলে কোনও জাতির সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক বিবর্তনের নিহিত স্তরগুলি খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

৪০৫.৩.১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১) সম্ভাষণের ভাষার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে এই ভাষা সম্পর্কে লেখো।

২) সম্ভাষণের ভাষা বলতে কী বোঝায়? এই ভাষার পরিচয় দাও।

৪০৫.৩.১.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত, 'বহুরূপে ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০১৬, প্রতিভাস, কলকাতা

২) ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩) ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪) ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫) শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে', ২০১৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক-২

‘লুপ্ত ভাষা’

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.৩.২.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.৩.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.৩.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.৩.২.১ : মুখবন্ধ

যার জন্ম আছে তারই মৃত্যু আছে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু একটা ভাষার মৃত্যুর কথা বললে অনেকেই বলবেন, ভাষার জীবন নেই। ভাষা কোনও প্রাণি নয়। তারপরও ভাষা কীভাবে মরে যায় বা বিলুপ্ত হয়? এরপরে ভাষার বাঁচা-র কথা বললে তাঁরাই নাক শিটকে বলবেন, ভাষার আবার বাঁচা কী? তাঁদের আশ্বস্ত করে বলা-ই যায়, ভাষার জীবন না থাকলেও, ভাষাও বাঁচে। ভাষারও মৃত্যু হয়। একটা ভাষা বেঁচে থাকে সেই ভাষায় মানুষের কথা বলার উপর। দৈনন্দিন ভাষা-চর্চার মাধ্যমে। কোনও কারণে সেই ভাষায় যদি কেউ কথা না বলে, দীর্ঘদিন ধরে যদি সেই ভাষার ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় লুপ্ত বা মৃত ভাষা। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে। ২০১০ সালের ২৬ জানুয়ারি আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ার হাসপাতালে মারা গিয়েছিলেন ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধা। তাঁর নাম বোয়া সিনিয়র। এটা শুনে অনেকেই বলবেন, মৃত্যু তো প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের হচ্ছে। কিন্তু এই বৃদ্ধার মৃত্যুটিকে আমরা মনে রেখেছি কেন? এখানে একটা ব্যাপার আছে। ওই বৃদ্ধাটি কথা বলতেন ‘আকা বো’ ভাষায় এবং তিনিই ছিলেন এই ভাষায় কথা বলা শেষতম মানুষ।

১৮৫৮ সালে ইংরেজেরা আন্দামানে উপনিবেশ গড়ে তোলার সময় বো উপজাতির মানুষের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। বোয়া সিনিয়র মারা যাওয়ার সময়ে সংখ্যাটা দাঁড়ায় বাহান্ন, যাঁদের মধ্যে কেউ-ই এই ভাষায় কথা বলতে জানতেন না। দীর্ঘ ৫২ বছর ধরে তিনি মাতৃভাষায় মনের কথা বলার সঙ্গী পাননি। আর এই যন্ত্রণা বুকে নিয়ে তাঁকে

পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে 'আকা বো' ভাষাটি। ২০১০ সালের ২৬ জানুয়ারির পর থেকে এই ভাষাটি লুপ্ত বা মৃত ভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। হারাধনের শেষ ছেলেটি তবু মনের দুঃখে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বনের ধারে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এই ভাষার মৃত্যুর পর ভেউ ভেউ করারও মতো কেউ আর নেই।

এক.

পরিসংখ্যান বলছে পৃথিবীতে প্রায় সাত হাজারের মতো ভাষা আছে। ভাবতে অবাক লাগে এই সাত হাজার ভাষা থেকে একটি ভাষা হারিয়ে গেল চিরতরে। মুছে গেল একটি ভাষার অতীত। মুছে গেল তাঁদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক, প্রকৃতি ও পরিবেশের নানান অভিজ্ঞতা। যার লিখিত কোনও সম্পদই ছিল না। বা থাকার উপায়ও গড়ে ওঠেনি কখনও। একেই বলে ভাষার মৃত্যু। ভবিষ্যতে হয়তো কেউ এই ভাষার বিষয়ে কিছুই জানতে পারবে না। সেই আদিকাল থেকেই ভাষার লুপ্ত হওয়ার ব্যাপারটি হয়ে আসছে। নানাভাবে এই ঘটনাটি ঘটে চলেছে। এর কোনও শেষ নেই। বিশ্বায়নের প্রভাবে হারিয়ে যাচ্ছে শত শত ভাষা।

বিশ্বজুড়ে এখন যে সাত হাজার ভাষায় মানুষ কথা বলে, তার মধ্যে ৪৩ শতাংশ ভাষা বিপদগ্রস্ত। মাত্র কয়েক'শ ভাষা শিক্ষাব্যবস্থা ও সরকারি কাজের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইন্টারনেট দুনিয়ায় ব্যবহৃত হয় একশোরও কম ভাষা। সে কারণেই বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ভাষার বিলুপ্তি এক কঠোর বাস্তবতায় পরিণত হয়েছে। অথচ একটি ভাষা যখন হারিয়ে যায়, তখন তার সঙ্গে হারিয়ে যায় সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতিও। এভাবে প্রতি বছরই বহু ভাষা চলে যাচ্ছে মৃতের তালিকায়। তার সমস্ত রেকর্ড রাখা সম্ভব হয় না। এর বাইরেও আরও মৃত ভাষা রয়ে গেছে, যাদের বিলুপ্তি নথিভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক বাজারের আন্তর্জাতিকীকরণ, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং বিশ্বায়নের অন্যান্য প্রভাবের কারণে ছোট ভাষাগুলোর অস্তিত্ব আরও বেশি হুমকির মুখে পড়ে গেছে। আধুনিক পৃথিবীতে যে ভাষা ইন্টারনেটে নেই, সে ভাষার অস্তিত্বও নেই। এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোনও ভাষার লুপ্ত বা মৃত হওয়ার কারণগুলি

১) ভাষাকে সঠিকভাবে ব্যবহার না করা

২) ভাষার কোন শব্দটি হারিয়ে যাচ্ছে সেটা শনাক্ত না করা

৩) ভাষাটিকে মানুষের মধ্যে প্রচার না করা

৪) ভাষাটিকে অবমূল্যায়ন বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা

৫) ভাষার কোনও লিখিত রূপ না রাখা

৬) সেই ভাষার বিকল্প হিসেবে অন্য ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া বা বিকল্প ভাষার ব্যবহার করা

৭) শিক্ষাব্যবস্থায় ভাষাকে ব্যবহার না করা

দুই.

ভাষা শুধু আত্মপরিচয়ের প্রকাশ নয়, কেন্দ্রীয় উপাদানও বটে। তাই ভাষার লুপ্ত হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন দেশের ভাষাবিজ্ঞানীরা চর্চা শুরু করেছেন। দেশে দেশে গবেষকদের মধ্যে চলছে নানান জল্পনা ও পরিকল্পনা। অনুসন্ধানে উঠে আসছে নানান তথ্য। ভাষার এই সংকট নিয়ে নানাভাবে উদ্যোগ নিয়েছে ইউনেস্কো। বিভিন্ন দেশে এই বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। তালিকা তৈরি করেছে কোন কোন ভাষা হারিয়ে গেল বিশ্ব থেকে, কোনগুলো হারিয়ে

যেতে বসেছে, কার লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, কেন হারিয়ে গেল, কীভাবে মানুষের এই অনন্য সৃষ্টিকে রক্ষা করা যেতে পারে ইত্যাদি নিয়ে উদ্যোগ। বিশাল তালিকা, মানচিত্র, তথ্যসমৃদ্ধ উপস্থাপনা। এই তালিকাও সম্পূর্ণ নয়। তবে মানবসভ্যতাকে বোঝার একটি যুগান্তকারী প্রয়াস। এর থেকে দেশে দেশে ভাষা নিয়ে যাঁরা ভাবছেন তাঁরা একটা পথ ঠিকই খুঁজে বের করবেন।

২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'দ্য হিন্দু' পত্রিকা 'The Livingg Tongue Institute and National Geographic Society' একটি খবর প্রকাশ করে। তাতে দেখা যায় দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকা, উত্তর অস্ট্রেলিয়া ও মধ্য-পূর্ব সাইবেরিয়া এই পাঁচটি অঞ্চলে বিপন্ন ভাষার সমস্যা বেশি। এই সমস্যা ভারতেরও। ভারতের প্রায় ৪০টিরও বেশি ভাষা আজ বিলুপ্তির পথে। এর কারণ মাত্র কয়েক হাজার মানুষ এই ভাষাগুলি ব্যবহার করেন। ইউনেস্কোর তালিকা অনুযায়ী যে সব ভাষা বিলুপ্তপ্রায়, তাদের মধ্যে রয়েছে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ১১টি ভাষা (গ্রেট আন্দামানিজ, জারওয়া, ল্যামংসে, লুরো, মুয়োট, অনগে, পু, সানেনো, সেন্টিলেজ, শম্পেন এবং টাকাহানিনিং), মণিপুরের ৭টি ভাষা (আমল, আকা, কইরেন, লামগাং, লাংগ্রং, পুরম এবং তারাও), হিমাচল প্রদেশের ৪টি ভাষা (বাঘাতি, হান্দুরি, পাঙ্গভালি এবং সিরমাদিও)। অন্য ভাষাগুলির মধ্যে রয়েছে ওড়িশার মান্দা, পারজি ও পেঙ্গু; কর্ণাটকের কোরাঙ্গা ও কুরুবা; অন্ধ্রপ্রদেশের গাদাবা ও নাইকি, তামিলনাড়ুর কোটা ও তোদা; ঝাড়খণ্ডের বিরহোর, মহারাষ্ট্রের নিহালি, মেঘালয়ের রুঘা এবং পশ্চিমবঙ্গের তোতো।

ভাষা বেঁচে থাকে মানুষের মুখে। যখন সেটির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় সমাজে। ভাষার আবেগ একটা স্রোতের মতো বইতে থাকে ভাষাভাষীদের মধ্যে। সেটি বোঝা যায় তাদের মধ্যে সেই ভাষায় ভাব বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। ভাষা কাগজে বা লেখার অন্য কোনও মাধ্যমেও বেঁচে থাকে; তবে সে ক্ষেত্রে ওই ভাষার লিখিত রূপ থাকতে হয়। কোনও গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষা বেঁচে থাকে। কোনও ভাষার ব্যবহার বাড়লে ভাষার পরিবর্তনের সম্ভাবনাও বাড়ে; একই সঙ্গে ভাষার আয়ুও বাড়তে থাকে। আবার কোনও ভাষার ব্যবহার সীমিত হয়ে পড়লে সেই ভাষার রূপবদলের সুযোগ কমে যায়; একই সঙ্গে ভাষার আয়ুও কমতে থাকে।

তিন.

সেই অতীতকাল থেকেই দেখা গেছে সমাজে যারা ভাষা ব্যবহার করে তাদের ইচ্ছায় সমাজ চলে না। কালের বিবর্তনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজশক্তির উত্থান হয়েছে। সেখানে শাসক ও প্রজার মধ্যে ভাষার ব্যবহার ভিন্নতা লক্ষ করা গেছে। সমাজের বিবর্তনের ধারণাও বদলেছে কালে কালে। যাযাবর থেকে স্থায়ী সমাজ গড়ে ওঠার ইতিহাস, এক দেশ থেকে অন্য দেশে আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাস, অর্থনীতির পরিবর্তনে ঔপনিবেশিক প্রথার ইতিহাস, শাসন-শোষণের ভাঙাগড়া তো বয়ে চলেছে নানাভাবে। ভাষা তো তারই সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হতে হতে বয়ে চলেছে। সেই প্রবাহ কখনও আপনার গতিতে কখনও বা রাষ্ট্রের ইচ্ছায় নানাভাবে প্রভাবিত হতে থাকে। তাই ভাষা হারিয়ে যাওয়ার সমস্যাও ভিন্ন। সেগুলির চরিত্রও আলাদা। উত্তর আমেরিকাতে ভাষা লুপ্ত হওয়ার ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক। সেখানে ভাষাগুলিকে লুপ্ত করার করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে রাষ্ট্রশক্তি। রাসেল থর্নটর্ন-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের সময় সেখানকার ভাষার সংখ্যা ছিল ২৮০। সেখান থেকে পাঁচশো বছরে প্রায় ১১৫টি ভাষা হারিয়ে গিয়েছে।

জনসংখ্যা যত বেড়েছে, বসবাসের জন্য ভৌগোলিক অবস্থান যত বেড়েছে ততই মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গেছে। কখনও যেতে বাধ্য হয়েছে। সেখানে গড়ে তুলেছে নতুন এক পরিবেশ। জন্ম হয়েছে নতুন ভাষার। 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা' গ্রন্থে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এমনই লিখছেন, "... এখন হইতে দুই হাজার বছর

পূর্বে ভাষা বিভেদ এতটা ছিল না। তখন এই সমস্ত ভাষার আদিরূপ ৮/৫ বা ৬ প্রকারের বিভিন্ন প্রাকৃতেই চলিত। এবং সব প্রাকৃতভাষা এতটাই কাছাকাছি ছিল যে পরস্পরের মধ্যে সুবোধ্য ছিল। দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাগুলির মধ্যে মালায়ালম দুই হাজার বৎসর পূর্বেকার প্রাচীন দ্রাবিড় বা তামিল হইতে পৃথক হয় নাই, কর্ণাট বা কানাড়ী ভাষা তামিলের খুব কাছাকাছি ছিল। কেবল অন্ধ্র বা প্রাচীন তেলেগু একটু পৃথক ছিল; অন্য দ্রাবিড় ভাষাগুলি তেমন বৈশিষ্ট্য লাভ করে নাই। তখন সাঁওতালী, মুণ্ডারী, হো, খড়িয়া, কোরকু, শবর, গদব প্রভৃতি আধুনিক কোল ভাষা সম্ভবত একটি মাত্র মূল কোল ভাষাতেই সমাহিত ছিল।"

চার.

একটা প্রশ্ন মাথায় আসতেই পারে ভাষা লুপ্ত হলে কী যায় আসে? পৃথিবীতে কত কিছুই তো হারিয়ে যায়, রূপান্তরিত হয়। তবে ভাষা গেলে ক্ষতি কী? উত্তরে বলা যায় প্রাণিজগতের, উদ্ভিদজগতের অনেক-কিছু লুপ্ত হয়ে যাওয়াতে যে কষ্টবোধ, যে হাহাকারবোধ আমাদের তাড়া করে ফেরে, ভাষা-বিলুপ্তি তার চেয়েও কষ্টের। এটা আমাদের বৈশ্বিক বৈচিত্রকে নষ্ট করে ফেলে। ভাষা মানুষের অস্তিত্ব ও অহমের অংশ। ভাষারক্ষা তো অস্তিত্বকেই রক্ষা, নিজের মাতৃরূপকে রক্ষা করা। মাতৃরূপ হল অস্তিত্বের এক অধিষ্ঠান যা জীবনের ও জগতের অবিচ্ছিন্নতাকে ভিতর থেকে রক্ষা করে চলে। ভাষা হারিয়ে গেলে সেই হারানোর বেদনা থাকে অপরিমাপিত। ধরা যাক, কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল লাইব্রেরি থেকে সব বাংলার বই পুড়িয়ে দেওয়া হল। ফলে বাংলা বিষয়ের চর্চার আর কোনও সুযোগ থাকল না। এরকম ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে রয়েছে। ৪৮ খ্রিস্টপূর্বে জুলিয়াস সিজারের লোকেরা আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরি পুড়িয়ে দিয়েছিল। চিনে একবার কনফুসিয়াসের সব বই পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এইরকম একটা ঘটনা ঘটলে কী থেকে বঞ্চিত হতে পারে বিশ্ব? আমাদের কী ক্ষতি হতে পারে? এমন ঘটনা যদি এখন ঘটে তাহলে জ্ঞানানুশীলনের বহু বিষয়ে অনুপ্রবেশের সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হব। যে দেশে এই ভাষাটির বিকাশ হয়েছিল সেই দেশের মানুষই তাদেরই লিপিবদ্ধ করেছিল। তাদের অর্জিত জ্ঞানের বিষয়গুলি পুড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানের ভাণ্ডারও হারিয়ে যাবে কালের গর্ভে। একটি ভাষা লুপ্ত হলে সেই ঘটনায় ঘটবে।

বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গে ভাষার সংখ্যা ১৭১। এর মধ্যে প্রায় ১৪৯টি ভাষা রয়েছে যার মধ্যে অনেকগুলিই লুপ্তপ্রায় ভাষার মধ্যে পড়ে। যেমন—সাদ্রি, থর, সূর্জপুরি, কোডা, লেপচা, শেরপা, রাই, মুরা, কুকি, কিসান, কোয়া, থাডো, তাংখল, কর্তী, বোয়ারি ইত্যাদি। এ তো গেল লুপ্তপ্রায় ভাষার কথা। এবার আমাদের প্রাণের ভাষা বাংলা-র কথা বলি। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমরা কি বাংলা ভাষার সঠিক ব্যবহার করছি? আমাদের বাংলা ভাষার সঙ্গে এখন মিশে গেছে ইংরেজি, হিন্দি, ফারসি, পর্তুগিজ, উর্দু-সহ অনেক ভাষা। এমন এমন বাংলা শব্দ আছে যেগুলি আমরা কোনওদিন জানিই না। অন্য ভাষার সাহায্য নিয়ে ব্যবহার করতে হয়। তা ছাড়া আমাদের সমাজ বর্তমানে ইংরেজি ভাষাকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আবার বাংলা ভাষা যেটুকু ব্যবহার করছি ততটুকু আবার ইংরেজি আদলে ব্যবহার করছি। আঞ্চলিক ভাষাকে এখন মোটামুটি অন্য চোখে দেখি। ভাষার শুধু সুষ্ঠু ব্যবহার না সেটি ব্যবহারে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে কালের বিবর্তনে আমাদের মনের ভাষা, প্রাণের ভাষা এক সময় বিলুপ্ত হতে পারে এটা কি মনে হয় না?

বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে ভাষার অস্তিত্বকে ধরে রাখা যে কোনও জাতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্থ সামাজিক, ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর অসম বিকাশ সংগঠিত হচ্ছে। যার ফলে ঘটছে ভাষার বিপন্নতা। এই বিপন্নতাকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলা আমাদের সম্ভব নয়। তবে এই সমস্ত ঘাত প্রতিঘাতকে সহ্য করেও ভাষাকে রক্ষা করতে হবে। লুপ্তপ্রায় ভাষাকে যত সম্ভব দ্রুত সংরক্ষণ করে

বাঁচিয়ে রাখার কর্মযজ্ঞে আমাদের সকলকে একত্রিত হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই হয়তো ভাষার প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শিত হবে।

৪০৫.৩.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১) লুপ্ত ভাষা বলতে কী বোঝো? ভাষা লুপ্ত হওয়ার কারণগুলি বিশ্লেষণ করো।

২) লুপ্ত ভাষার স্বরূপ উল্লেখ করে এই ভাষা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা করো।

৪০৫.৩.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত, 'বহুরূপে ভাষা' (চতুর্থ খণ্ড), ২০১৭, প্রতিভাস, কলকাতা

২) অভীক গঙ্গোপাধ্যায়, 'ভাষার মৃত্যু লুপ্ত ও বিপন্ন ভাষার খোঁজে', ২০১২, ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, কলকাতা

৩) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা', ১৩৫৬, রূপা, কলকাতা

৪) কাকলি মুখোপাধ্যায়, 'বিপন্নভাষা ও ভারতবর্ষ', ২০২১, অনীশ সাংস্কৃতিক পরিষদ, কলকাতা

৫) সুকুমার সেন, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', ১৯৮৩, ইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা

৬) ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ' (২০২২), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক-৩

‘খবরের ভাষা’

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.৩.৩.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.৩.৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.৩.৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.৩.৩.১ : মুখবন্ধ

মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন আর খবর যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মানুষের জীবন, পারিপার্শ্বিক সমাজ, নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হল খবর তৈরির আঁতুড়ঘর। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর রোজকার খবর জানতে পারার আগ্রহ সকলেরই। আর প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া ঘটনা সংবাদরূপে তুলে ধরা হয় বিভিন্ন মাধ্যমে। সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন, বর্তমানে অনলাইনের বিভিন্ন পোর্টাল খবর প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। আর খবরের ভাষারও নিজস্ব একটা ধরন বা শৈলী রয়েছে। ভাষা হল ভাব প্রকাশের মাধ্যম, কিন্তু ভাষা তো বৈচিত্রময়, তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রের ভাষায় ভিন্নতা লক্ষণীয়। খবর একাধিক ভাষাতে প্রকাশিত হয়, এ ছাড়াও একই ভাষার ক্ষেত্রে যেভাবে সাধারণ মানুষ কথা বলে, অথবা পাঠ্যপুস্তকের ভাষা যেমন হয় তার থেকে খবরের ভাষায় কিছুটা হলেও স্বতন্ত্রতা দেখা যায়।

এক.

সংবাদপত্রগুলিতে খবর যেভাবে পরিবেশিত হয় তার থেকে টিভিতে বা বেতারে প্রকাশিত খবরের ভাষায় কিছুটা ভিন্নতা দেখা যায়। বর্তমানে প্রযুক্তির যুগেও খবরের কাগজের চাহিদা ব্যাপক। সকালে ঘুম থেকে উঠে

খবরের কাগজে চোখ বোলাতে না পারলে অনেকের কাছেই দিনটা যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই খবরের কাগজের ভাষাতে শব্দ প্রয়োগে বৈচিত্র ও বিভিন্ন শব্দের একচেটিয়া ব্যবহারও লক্ষণীয়। "দ্বন্দ্ব রুখতে কী দাওয়াই নেত্রীর, নজর", এই 'দাওয়াই' শব্দটি এখানে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু দাওয়াই শব্দটি যেন সংবাদের শিরোনামে আলাদা মাত্রা যোগ করে। এই শব্দটির প্রয়োগ খবরের পাতায় বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়। এ ছাড়াও মুখের ভাষাতেও যেসব শব্দের বহুল ব্যবহার নেই সেসব শব্দও অনায়াসে সংবাদপত্রের শিরোনামে স্থান পায়। রাজনৈতিক খবরের ক্ষেত্রেও এমন অনেক শব্দ হেডলাইনে জায়গা করে নেয়। যেমন—"মনোনয়নের জমা করার দিনেও তরজা দু'পক্ষের"। 'তরজা' বলতে সাধারণত বোঝায় কবির লড়াই বা কবিগান জাতীয় সঙ্গীত। কিন্তু রাজনৈতিক খবরে দুই দলের কথা কাটাকাটি বা দ্বন্দ্ব অর্থে 'তরজা' শব্দটি খবরের শিরোনামে এসেছে।

একটি নির্দিষ্ট এলাকার জলের অপর্যাপ্ত জোগান নিয়ে শাসক দল ও বিরোধী দলের মধ্যে যে সংঘর্ষ সেই খবর প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে—"শাসক দলকে 'ডোবাবে' জল, আশা বিরোধীদের"। দলের পরাজয় অর্থে ডোবাবে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। খবরে এরকম বিভিন্ন শব্দ উঠে আসে বারবার। একটা খবর পড়তে গিয়ে দেখা গিয়েছিল তৃণমূল অর্থাৎ জোড়াফুল এবং বামফ্রন্ট সরকারের দ্বন্দ্বকে খবরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলেও শিরোনামে তৈরি করা হয় কৌতূহল। যেমন— "বাতিলেও, বিক্ষোভেও? দুই ফুলের নিশানায় বাম"। তৃণমূল দলের কথা সরাসরি না বলে 'দুই ফুল' শব্দটি এবং বামফ্রন্ট সরকার পুরো শব্দটি ভেঙে শুধু 'বাম' শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। সংবাদপত্রের সিংহভাগ জুড়েই রয়েছে রাজনীতি। রাজনৈতিক ঘটনাবলী প্রতিদিন তৈরি করে দিচ্ছে খবর ও খবরের নিত্যনতুন ভাষা। আবার খবরের মাধ্যমেই রাজনীতির মারপ্যাঁচ সহজেই পৌঁছে যাচ্ছে জনসাধারণের কাছে। এক্ষেত্রে খবরও নিয়ন্ত্রণ করছে রাজনীতির উত্থানপতন। সহজ সরল ভাষার মাধ্যমে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে খবর পরিবেশন করা হচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিরোধীদের উদ্দেশে একদল যখন আরেক দলকে আক্রমণ করে কিছু বলেন তখন 'বিঁধলেন' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে, প্রকাশিত একটি খবরে বলা হয়েছে "ভিন্ন মেজাজে দেব, বিঁধলেন বিজেপিকে"। কোনও কিছুর আবেদনকে 'আর্জি' হিসেবেই লেখা হচ্ছে খবরের কাগজের পাতায়। 'আর্জি খারিজ' অথবা "অভিষেকের মন্তব্যে ব্যবস্থা নিতে আর্জি", "আরও কারচুপি থাকতে পারে, কবুল সিদ্ধার্থের" ইত্যাদি। 'আর্জি', 'খারিজ', 'কবুল' ইত্যাদি শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে আরবি ভাষা থেকে আগত বিদেশি শব্দ। অথচ বাংলা ভাষার খবরে এই শব্দগুলির বহুল প্রয়োগ খবরের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

এ ছাড়াও কিছু কিছু শব্দ যেগুলি আমরা মুখে সচরাচর ব্যবহার করি না সেসব শব্দের ব্যাপক প্রয়োগ খবরের ভাষায় পাওয়া যায়। যেমন—"পুলিশের গুলিতে নিহত ভারতীয় বংশোদ্ভূত" অথবা "বাংলাদেশি স্ত্রীকে মারধরে ধৃত স্বামী-সহ দুই"। এখানে নিহত অথবা ধৃত শব্দের ব্যবহার আমাদের কথ্য ভাষায় তেমন থাকে না বরং 'মৃত', 'মারা গেছে', 'ধরা পড়েছে' এই শব্দগুলি আমরা কথা বলার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু খবরে 'নিহত', 'ধৃত' শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। এ ছাড়াও "বধূ নির্যাতন", "রাস্তায় হীরক প্রাপ্তি", "চাকরির নামে টাকা নিয়ে প্রতারণার অভিযোগ", "প্রৌঢ়কে বেধড়ক মার" ইত্যাদি বাক্যবন্ধে আমরা একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাব 'বধূ', 'হীরক', 'প্রাপ্তি', 'প্রতারণা', 'প্রৌঢ়' ইত্যাদি শব্দ দৈনন্দিন জীবনের সংলাপে আমরা কিন্তু ব্যবহার করি না। বরং বধূর পরিবর্তে বউ, হীরকের পরিবর্তে হীরে, প্রাপ্তির বদলে পাওয়া, প্রতারণা অর্থে ঠকানো, প্রৌঢ় শব্দটির পরিবর্তে বুড়ো বা বৃদ্ধ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারে আমরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। প্রতিদিনের জীবনে আমরা এই শব্দগুলি ব্যবহারের অভ্যস্ত, কিন্তু

খবরে এই শব্দগুলির ব্যবহার খবরের ভাষার একটা স্বতন্ত্র রূপ গড়ে তুলেছে, যেখানে শুধু মুখের ভাষাই স্থান পায় না বরং বিদেশি শব্দ, তৎসম শব্দ, অপ্রচলিত শব্দও ব্যবহৃত হয়।

কখনও কখনও সংস্কৃত শব্দবন্ধও শিরোনাম হিসেবে ব্যবহৃত হয় খবরের ভাষায়। বেঙ্গালুরু, মুম্বাই, চেন্নাই, লখনউ, জয়পুর, দিল্লি ইত্যাদি স্থানে জলের অপ্রতুলতা বা ভীষণ জলকষ্টের খবরটি যখন সংবাদপত্রে তুলে ধরা হয়েছিল তখন শিরোনামে লেখা হয়েছিল "জলবৎ কঠিনম। কিছুদিন আগে দেখা গেছে একটি খবরের শিরোনামে লেখা হয়েছে "লেখার বদলে ফ্লেক্স, দেওয়াল যুদ্ধে নতুন কৌশল" এই যে "দেওয়াল যুদ্ধ", "কঙ্কাল কাণ্ড", "আইপিএলে কলঙ্কের দাগ" ইত্যাদি শব্দবন্ধের প্রয়োগ খবরকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

দুই.

সংবাদপত্রে রাজনীতি, অর্থনীতি, খেলাধুলো, বিনোদনমূলক নানা খবর প্রকাশিত হয়। চাকরি অথবা কর্মসংস্থান কোনও দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বর্তমানে চাকরি পাওয়াটাই যেন মরীচিকার মতো। এই খবরটিই যখন খবরে প্রকাশ পায় তখন বলা হয় "চাকরির বাজারে আগুন", এ ছাড়াও "ভোট প্রচারে ভরসা টোটো-অটো, রোজগার," "উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে" অথবা "তেল আমদানির খরচ বৃদ্ধির ইঙ্গিত, সঙ্গী আশঙ্কাও", "আখের রসের চাহিদা, তবু টান জোগানে" ইত্যাদি শব্দবন্ধ দেশের অর্থনীতি অথবা অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি উপস্থাপন করে। এ ছাড়াও দেখা গেছে কোনও কোনও শব্দের বানানের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটানো হয়, যেমন—"শর্তসাপেক্ষ নিষেধাজ্ঞা উঠল পেঁয়াজ রফতানিতে"। সাধারণত রপ্তানি শব্দটির ব্যবহার-ই আমরা দেখি কিন্তু খবরে সেটিকে একটু পালটে নিয়ে রফতানি লেখা হয়েছে। এ ছাড়াও সংবাদপত্রে কাব্যিক ভাষার কোনও প্রয়োগ না থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিরোনামে অনুপ্রাসের ব্যবহার করে কাব্যিক মূর্ছনা তৈরি করা হয়েছে। যেমন—"ভোট যোগ হলে কি ঘুরবে খেলা, অপেক্ষায় ভগবানগোলা"।

খবরে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার কথাও উঠে আসে "কোটায় আত্মহত্যা", "শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ, কারণ ঘিরে ধোঁয়াশা", "মাদক উদ্ধার", "নারী পাচার চক্র", "বধূ নির্যাতন", "যৌন হেনস্থার প্রতিবাদ করায় মার" ইত্যাদি। কখনও কখনও খবরের ভাষায় বাগধারার ব্যবহারও লক্ষ করা গেছে। যেমন— হইচই অর্থে 'ডামাডোল'"ছাত্রমৃত্যুতে ডামাডোল, কাজ বন্ধ এনআইটি-তে"। এ ছাড়াও বিনোদন জগতের বিভিন্ন খবর স্থান পায় সংবাদপত্রের পাতায়। বিনোদনের খবরগুলিরও নিজস্ব ভাষা রয়েছে। সেখানে গসিপ, সত্যি, আবেগ, কল্পনা, বিতর্ক, সাক্ষাৎকার, খবর সবকিছুই রয়েছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে চলে বিতর্ক, জানা যায় তারকাদের জীবনের অজানা কাহিনি "ববির সঙ্গে সম্মুখসমরে আলিয়া"। এখানে তারকাদের মধ্যে বাকবিতণ্ডা অর্থে 'সম্মুখসমর' শব্দের প্রয়োগ করা হয়েছে। এ ছাড়াও সংবাদপত্রের রবিবাসরীয়তে বিভিন্ন ধারাবাহিক উপন্যাস, ছোটোগল্প, বিভিন্ন মনীষীর জীবনী প্রকাশিত হয়। পাশাপাশি রন্ধনপ্রণালী ও সঠিক খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে বিভিন্ন নির্দেশ দেওয়া হয়। সেখানেও ভাষার বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অভিনেতা বসন্ত চৌধুরীকে নিয়ে বলতে গিয়ে অশোক কুমার দাস বলেন, "শুধু একজন সংগাহক নন, ছিলেন নিষ্ঠাবান গবেষকও।" এভাবেই বিখ্যাত ব্যক্তিত্বদের কথা, জীবনকাহিনি ভাষার বিচিত্র প্রয়োগে তুলে ধরা হয়েছে সংবাদপত্রের পাতায়।

তিন.

সংবাদপত্রে শেষের দিকে থাকে খেলার খবর, খেলা নিয়ে বাঙালি আবেগপ্রবণ তাই বাইশ গজের খবর নিয়ে মেতে ওঠে তারা। "আক্রান্ত বোলারই জয়ে ফেরালেন নাইটদের", " অভিমানী রোহিত মুম্বই মন্দির তৈরি করেছি কিন্তু আমি", "পন্থ নেই বিরাটদের বিরুদ্ধে, ধোনিদের আজ কঠিন লড়াই" ইত্যাদি বাক্যে শব্দের সাবলীল প্রয়োগ খেলার খবরকে আকর্ষণীয় ও কৌতূহলজনক করে তোলে। 'কভার ড্রাইভ', 'স্পিন', 'ক্যাচ', 'রান আউট', 'উইকেট কিপার', 'আম্পায়ার', 'স্কোয়ার কাট' ইত্যাদি ক্রিকেট খেলার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শব্দ আমাদের অচেনা। ক্রিকেটের পাশাপাশি ফুটবল নিয়েও অনেক মাতামাতি লক্ষ করা যায়। ফুটবলের ভাষা "দিমিত্রিয়স নিয়ে আশায় ইস্টবেঙ্গল", "বায়ার্নকে উপেক্ষা নয় ভিনিদের আনচেলোত্তির", "স্তিমাচের দলে মোহনবাগানের আট"। এ ছাড়াও 'কোচ', 'রেফারি', 'কিক', 'স্ট্রাইকার', 'পেনাল্টি' ইত্যাদি ফুটবলের ভাষা সংবাদপত্রের মাধ্যমে খেলার মাঠ থেকে উঠে আসে আমাদের ঘরে।

সংবাদপত্রের ভাষা যথাযথ, সর্বজনবোধগম্য ও গহণযোগ্য হয়ে থাকে। কারণ সংবাদ উপস্থাপনের উপরেই নির্ভর করে সংবাদপত্রের সার্কুলেশন। আর সময় পরিবর্তনশীল সেই সঙ্গে যুগের দাবিও পালটায়। নিত্য নতুন ভাষা প্রয়োগ ও অভিনব শৈলীর উপরেই সংবাদ উপস্থাপনের গুণমান নির্ভরশীল। সংবাদপত্রের ভাষায় বাক্যে ক্রিয়াপদের ব্যবহারও তেমন নেই, শিরোনামে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত-ই হয় না। সংবাদপত্রে দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার বর্জনীয়, ছোটো ছোটো বাক্যের মাধ্যমে বিষয়কে তুলে ধরে খবর পরিবেশন করা হয়। সংবাদপত্রের খবরের ভাষার মূল ভিত্তি হল বোধগম্যতা ও সরলতা। একটা সংবাদপত্র পড়তে যে কোনও বইয়ের থেকে অনেক কম পরিশ্রম বা কম সময় লাগে। সংবাদপত্রের খবরের ভাষার শব্দ, বাক্য, অর্থ, ধ্বনি, ছন্দ সবকিছুর সঙ্গেই সহজতা-সরলতা-প্রাঞ্জলতার গভীর যোগ রয়েছে।

চার.

বেতারের মাধ্যমেও বিভিন্ন ধরনের খবরের অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। বেতারের খবরকে বলা হয় ড্রাই নিউজ। বেতারে খবর প্রকাশিত হয় বর্ণনাত্মক ভঙ্গিতে। বেতারে দৃশ্য-ঘটনাবলী উপস্থাপনের কোনও সুযোগ নেই। সুযোগ নেই সংবাদপত্রের মতো একটি খবর বারংবার পড়ার বা বিশ্লেষণের। বেতারের মাধ্যমে প্রচারিত খবরের ভাষার ক্ষেত্রে শব্দের স্পষ্ট নির্মেদ উচ্চারণ, কণ্ঠস্বর এগুলিই সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। বেতারের যে খবরগুলি উপস্থাপন করা হয় তাতে কঠিন, দীর্ঘ শব্দ বা বাক্যের ব্যবহার নেই বললেই চলে। তবে অনেক সময় বিশেষ কাব্যিকতা বা নাটকীয়তার আনার জন্য ছড়ার ছন্দে অন্ত্যানুপ্রাস যুক্ত বাক্যের প্রয়োগ করা হয়। একই বাক্য বারংবার যাতে ব্যবহৃত না হয়, বহুবচন ব্যবহারের আতিশয্য যাতে না ঘটে, ভাষার অস্বচ্ছতা যেন দেখা না যায় এসব দিকে বিশেষ সতর্কতা রাখা উচিত।

বেতারের পাশাপাশি বর্তমান সময়ে খবর প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হল টিভি, বেতারের ভাষার সঙ্গে টিভির ভাষার গভীর সংযোগ রয়েছে। যদিও টিভির সঙ্গে একইভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছে দৃশ্য ও শ্রাব্যের বিষয়টি। টিভির ভাষার মাধ্যমে কোনও খবর প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয়। টিভির কাজ তথ্যপ্রদান "to educate and to entertain"। টিভিতে স্ট্রেটকাট ভাষায় খবর পরিবেশিত হয়। অনেক সময় ভাষাতে রং থাকে কিন্তু অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি থাকে না। টিভির ভাষায় কখনওই খতম করা, খুন করা, দেখে নেব, কেটে ফেলা ইত্যাদি

যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার দেখা যায় না। তার পরিবর্তে মারা পড়েছে, নিহত হয়েছে, মৃত্যু হয়েছে, প্রয়াণ ঘটেছে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে ইত্যাদি যৌগিক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। "বিষ খেয়ে মরেছে" বা "গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে" এইসব জায়গায় "আত্মহত্যা" শব্দটি এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা হলে "দুটি গোষ্ঠী মধ্যে সংঘর্ষ" ইত্যাদি বাক্য ব্যবহৃত হয় টিভির খবরের ভাষায়।

টিভিতে প্রচারিত খবরের ভাষা দৈনন্দিন জীবনের ভাষা হলেও তা হয়ে ওঠে মার্জিত, গ্রহণযোগ্য। কোনওভাবেই বাজার চলতি অমার্জিত লঘু ভাষা ব্যবহার করা যায় না টিভিতে। টিভিতে খবর প্রচারের ক্ষেত্রে বাগযান্ত্রিক ভাষার পাশাপাশি রয়েছে ছবির ভাষা, উপস্থাপকের শরীরী ভাষা। এখানে জেলে, চাষি, অন্ধ ,কানা, বোবা ইত্যাদি শব্দের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় মৎস্যজীবী, কৃষক, দৃষ্টিহীন, মূক, বধির ইত্যাদি শব্দ। খবরের পাতায় কোনও বিখ্যাত ব্যক্তির নাম ধরে লেখার রীতি প্রচলিত আছে। যেমন—মমতা, মোদী প্রমুখ। কিন্তু টিভিতে সেভাবে বলা হয় না। পরিবর্তে বলা হয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রমুখ। এভাবে টিভির ভাষারও নিজস্ব একটা সংরূপ গড়ে উঠেছে।

বর্তমানে অনলাইনেও বিভিন্ন খবর পরিবেশিত হয়,তার ভাষায় থাকে দৈনন্দিন ব্যবহৃত শব্দের বাহুল্য। এ ছাড়াও খবরের শিরোনামটাই প্রাধান্য পায় অনলাইনে প্রকাশিত খবরগুলির ক্ষেত্রে, কৌতূহল যাতে বৃদ্ধি পায় এবং পাঠক যাতে সংবাদপাঠে আগহী হয়ে ওঠে সেই অনুযায়ী শব্দ বা বাক্য প্রয়োগ করা হয়। যেমন—"শুটিং ফ্লোরে দুটি খুন"। আসলে এটি একটি ওয়েব সিরিজের কাহিনি, এই ঘটনাকেই সহজ সরল ভঙ্গিতে নাটকীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে খবরে, "ঘাড়ে ব্যথার কারণ টেক নেক নয় তো?" এমন বিভিন্ন জায়গায় ইংরেজি শব্দের বহুল প্রয়োগ অনলাইনে প্রকাশিত খবরগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায়।

দিন বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদল আসে খবরের ভাষাতেও, প্রতিদিনের নিত্যনতুন ঘটনা নতুনভাবে পরিবেশিত হয়। সংবাদ কীভাবে ভাইরাল হবে বা কোনও খবর পাবলিক কতটা গহণ করবে সেদিকেই সবচেয়ে বেশি নজর দেওয়া হয়। টিভির সঙ্গে বেতারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও তাদের খবরের ভাষার পরিকাঠামো মূলত একই। আবার রেডিয়ো বা টিভির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই করে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হয় খবরের কাগজকে। তবে খবর যে মাধ্যমেই প্রচারিত হোক না কেন ভাষার স্বাতন্ত্র্য, নিজস্বতা, সহজতা, সরলতা, প্রাঞ্জলতা, গ্রহণযোগ্য উপস্থাপন সবক্ষেত্রেই বিদ্যমান।

৪০৫.৩.৩.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. উদাহরণসহ খবরের ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপণ করো।

২. কোন কোন মাধ্যমে খবর প্রকাশ বা সম্প্রচারিত হয়? সেইসব মাধ্যমে প্রকাশিত বা সম্প্রচারিত খবরের ভাষার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো।

৩. খবরের ভাষা বোলতে কী বোঝো? বিভিন্ন প্রকার খবরের ভাষাগত দিক বুঝিয়ে দাও।

৪০৫.৩.৩.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত, 'বহুরূপে ভাষা'(প্রথম খণ্ড), ২০১৫, প্রতিভাস, কলকাতা

২. ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা'(প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩. ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা'(দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪. ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে', ২০১৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক-৪

‘ভয়ের ভাষা’

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.৩.৪.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.৩.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.৩.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.৩.৪.১ : মুখবন্ধ

ভয় জন্মের আগে থেকেই সৃষ্টি হয়। তার ভাষাও ভিন্ন। সমাজে কোনও নারী সন্তানসম্ভবা হলেই তার মনে প্রথম ভয় আসে। সেটা ‘লোকের প্রশ্নের ভয়’। পুত্রসন্তান না কন্যাসন্তান? সবাই হয়তো তাকে বলে চাঁদের মতো ফুটফুটে পুত্রসন্তান যেন সে জন্ম দেয়। বলে ঘরে কার্তিক আসবে। কোনও দেবীর নাম করে আশীর্বাদ দেওয়া হয় না কেন? তাকে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকানো হলে বাইরে অপেক্ষারত সবার কাছে তখন ভয়ের ভাষা ডাক্তার এসে না বলে, ‘কন্যা সন্তান’। এমনকী পুত্র সন্তান হলেও প্রশ্নের থেকে রেহাই নেই। ‘হ্যাঁগো ফর্সা হয়েছে তো!’ এইভাবে শুরু হয় একটি শিশুর পৃথিবীতে আসা থেকেই ভয় ও তার ভাষা।

কিন্তু তখনও সরাসরি ভয় কী সে বোঝে না। বোঝে তখন, যখন তার দুষ্টুমিতে কেউ চোখ পাকিয়ে বলে ‘চোপ’। তার খিলখিল হাসি মিলিয়ে যায় কান্নায়। সে শিখল ‘চোপ’ হল ভয়ের ভাষা। এবার সে এই বলে অন্য কাউকেও ভয় দেখাতে পারবে। শুধু তাই নয়, ভয়ের সঙ্গে যে অভিব্যক্তিও জড়িত তা বুঝতে পারে। যেমন— চোখ বড় বড় করা। এরপর যখন সে বড় হতে থাকে, তখন একেকটা ধাপে তার কাছে ভয়ের ভাষাগুলো ক্রমশ আলদা হতে শুরু করে। যেমন— স্কুলে গেলে শিক্ষকের কাছে বকুনি শোনার ভয় ‘আজকেও পড়া করিসনি! মেরে হাঁড় ভেঙে দেব।’ কৈশোরের পরে প্রেম-প্রস্তাবের উত্তরে ‘না’ শোনার ভয়। পড়াশোনা না করলে বাবার কাছে ধমকের

ভয়'ওকে বাড়ি থেকে বের করে দাও।' পড়াশোনার শেষে বেকার অবস্থায় লোকেদের কাছে প্রশ্নের ভয় 'কিরে! চাকরি পেয়েছিস?' এমনকি চাকরি পেলেও বসের হুমকির ভয় 'বদলি করে দেব।' কিংবা 'কাল থেকে তোমায় আর আসতে হবে না।'

এক.

ভয়ের ভাষা আবার কাল, স্থান, লিঙ্গ, বয়স ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়। যেমন— পুরুষ হলে 'বেকার' শব্দটির ভয়, নারী হলে 'রেপ' শব্দটির ভয়। অসৎ হলে 'আপনি বড্ড বেড়েছেন ওপরে জানাব'। আবার সৎ হলে 'আপনার বদলির ফাইল রেডি'। আবার মিথ্যা কথা বললে 'মাকে বলে দেব', 'বাবাকে বলে দেব' ইত্যাদি। সেলুনে গেলে 'ব্লেডটা নতুন তো'? কোনও ভাইরাসের ভয়। কিংবা ইঞ্জেকশনের আগে 'সিরিঞ্জটা সিলপ্যাক তো'? বন্ধুরা বলে, 'অচেনা অ্যাপ একদম খুলবি না। কে কখন বাঁশ দিয়ে দেবে। টেরও পাবি না।'

ভাষা এবং জলের চরিত্র একই। যে পাত্রেই রাখি না কেন তারই আকার ধারণ করে। নিজের কেউ যখন বলে 'তোমার মেয়েটা কী সুন্দর দেখতে হয়েছে গো।' তখন তার আনন্দে মন ভরে ওঠে। আবার এই প্রশংসাই যখন অন্যরকম ভাষায় হয়, পাড়ার কোনও বকাটে ছেলে বলে, 'দাদা, মেয়েটা তো হেব্বি দেখতে হয়েছে।' তখন আবার ভয়ের সৃষ্টি হয়। সময়ও কোনও একটি শব্দকে ভয়ের করে তুলতে পারে। দিনের বেলায় একটি জায়গাকে 'নির্জন' বলেই সুন্দর লাগে। আবার রাতে এই 'নির্জন' শব্দটিই ভয়ের সৃষ্টি করে। কখনও কখনও আবার খুব সামান্য কথাও বিশেষ পরিস্থিতিতে ভয়ের ভাষা হয়ে যায়। যেমন— পকেটে টাকা না থাকলে বন্ধু-বান্ধবী যখন বলে, 'চল একটু ঘুরে আসি।' কথাটা ভয়ের হয়ে দাঁড়ায়। কিংবা বন্ধু যখন ফ্ল্যাটে এসে বলে, 'বাহ! তোর ফ্ল্যাটটা তো বেশ বড়। তুই কি একা থাকিস?' কথাটায় সে ভয় পেয়ে গেল। তার মনে সন্দেহ হয় বন্ধুত্বটা এবার উৎপাতে না পরিণত হয়। কখনও আবার প্রশংসাও ভয়ের উদ্রেক করে 'তোর বউয়ের রান্না তো বেশ ভালো।' এ কথা যদি মা-বাবা বলে, তাহলে কিন্তু ভয়ের কোনও কারণ নেই। কিন্তু আসন্ন পয়লা জানুয়ারির পিকনিকের আগে একই কথা যখন বন্ধুরা বলে তখন কিন্তু এটা ভয়ের। কারণ রান্নার ঝামেলাটা তার বউয়ের ঘাড়ে এসে পড়ার সম্ভাবনা থাকে।

ছেলেবেলা থেকে ভয়ের ভাষা কিন্তু শুরু হয় শারীরিকভাবেই। পড়া না পারলেই স্যারের কাছে 'কান মুলে দেব', বড় হওয়ার সঙ্গে তা 'ছাল তুলে দেব' কিম্বা 'হাড় ভেঙে দেব'-তে পরিণত হয়। প্রেমে পড়লে আবার তার বাবা-দাদার থেকে ভয় 'এ পাড়ায় আর যদি তোকে দেখি'। কখনও আবার গালাগাল, খিস্তি যোগ করে ভয়কে দ্বিগুণ করা হয়, 'মেরে গাঁড় ভেঙে দেব', 'এমন ঠাপ দেব বাপের নাম ভুলে যাবি' ইত্যাদি। এখানে যে বক্তা কোনও গুন্ডা-বদমাইশ এবং ভয় যে প্রাণহানিরও হতে পারে, তার উপযুক্ত ভাষাই সে ব্যবহার করে।

নতুন বউয়ের কাছে আবার বয়স্কদের ভাষা থেকেই বেশি ভয় আসে, কেউ কেউ ছেলেকে টিপ্পনী কেটে বলে 'প্রথম রাতেই বেড়াল মেরে রাখিস বাছা' কিংবা 'হলুদ জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে'। সে কথার ভয়ে সবার মন জুগিয়ে চলতে শুরু করে, পাছে তাকে শুনতে না হয় 'বাপ-মা এটাও শেখায়নি?' কিংবা 'বাপের বাড়ি দিয়ে আসব।'

দুই.

কোথাও লজ্জার ভয়, কোথাও প্রাণের, কোথাও আবার রোজগারের। সবক্ষেত্রেই ভয়ের ভাষা আলাদা। অফিসে বস যখন বলে, 'এবার ডানা ছাঁটতে হবে।' প্রেমে বন্ধুরা যখন বলে, 'ওর সঙ্গে প্রেম করছিস শিওর বাঁশ খাবি।' কিংবা প্রডিউসর অভিনেত্রীকে যখন বলে, 'ডিনারে চল।' এ সবই ভয়ের সৃষ্টি করে। কিছু কিছু শব্দ যেন ভয় সৃষ্টির জন্যই 'জুজু', 'নির্জন', 'অনেক রাত', 'একা', 'না', 'দূর', 'নয়ছয়', 'চোট যাওয়া', 'ছিনতাই', 'অমনোনীত' ইত্যাদি।

কিছু কিছু হুমকির উদাহরণ আবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্থায়ী ভয়ের ছাপ রেখে যায়। প্রেমে ব্যর্থ প্রেমিক যখন বলে 'মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেব' কিংবা 'রেপ করে দেব'। তখন একটি মেয়ের কাছে এর থেকে ভয়ের বোধহয় আর কিছু হয় না। রাজনীতি করলে আবার ভয়ের ভাষা আলাদা, 'দানা ভরে দেব', 'কুপিয়ে পুঁতে দেব', 'ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেব', 'ঘরে ছেলে ঢুকিয়ে দেব', 'ছেলে-বউ নিয়ে থাকিস তো'। কাজের ক্ষেত্রে হুমকি আসে, 'চাকরি খেয়ে নেব', 'ট্রান্সফার করে দেব'। স্বরযন্ত্রকারীর হুমকি 'সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আঙুল বাঁকাতে হবে'। শত্রুর কাছে শোনার ভয়, 'হাতে মারব না, ভাতে মারব তোকে'। আবহাওয়াবিদ হুমকি দেয়, 'ঘুর্ণিঝড় ধেয়ে আসছে', 'গরম এবার রেকর্ড ছাড়াবে'। ছেলেমেয়েকে শাসানি, 'ভালো রেজাল্ট না করলে বিয়ে দিয়ে দেব', 'বাড়ি থেকে বের করে দেব' ইত্যাদি। প্রেমিককে হুমকি, 'এ বছর চাকরি না পেলে বাবার দেখা ছেলেকে বিয়ে করে নেব।' পুলিশের হুমকি, 'এ তল্লাটে দেখলে জেলে ভরে দেব।' ডাক্তারের হুমকি, 'রোজ ওষুধ না খেলে রোগ সারবে না।' কোনও কোনও দোকানে আবার লেখা থাকে, 'আপনি সিসিটিভির নজরে রয়েছেন'। এও এক ধরনের হুমকি। যাতে কেউ কিছু চুরি করার আগে ভাবে। এগুলি শুধু তাৎক্ষণিক হুমকি বা ভয়ের ভাষা নয়, প্রত্যক্ষভাবে এ হুমকি কেউ না দিলেও এর ভাষাতেই ভয় লুকিয়ে থাকে।

ভয় যে কেবল মানুষের হুমকিতেই আসবে তা কিন্তু নয়। আসলে ভয়ের নির্দিষ্ট কোনও ভাষা নেই। মানুষ ও পরিস্থিতি ভেদে তা ভিন্ন। যেমন— গ্রীষ্মকালে অনেকে 'গরম' শব্দটাতেই ভয় পায়। আবার বয়স্কদের কাছে 'শীত' ভয়ের। কেউ আবার 'লং-ড্রাইভ' প্রপোজাল শুনে খুশিতে নেচে ওঠে, কেউ আবার ভয় পায়, 'উলটো পালটা কিছু হবে না তো?' মেয়েদের আবার 'রাত' শব্দটাতেই আতঙ্ক ধরিয়ে দেওয়া হয়। ছোট থেকেই তাকে বলা হয় 'রাত করবি না কিন্তু।' ছেলেদের নিয়ে আবার ভয় 'নেশা করে আসিস নি তো?' পরীক্ষার্থীর কাছে ভয় 'ফেল' শব্দতে। প্রেমে পড়া মেয়ের কাছে ভয় 'সম্বন্ধ' শব্দে। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের ভয় 'বেকার', 'গরিব' শব্দে। খেলোয়াড়দের কাছে 'বাউন্সার', 'ইয়োরকার'-এর ভয়। ফুটবল মাঠে 'মালাইচাকি খুলে যাওয়া'-এর ভয়। রাজনৈতিক নেতাদের 'গদি হারানো' কথায় ভয়। গরিব চাকরিপ্রার্থীর কাছে 'ঘুষ' শব্দে ভয়।

তিন.

অনেক সময় কিছু ভুল ধারণা থেকেও প্রচলিত ভয়ের সৃষ্টি হয়। 'ফুচকা ড্রেনের জল দিয়ে বানায়', 'কোল্ড ড্রিঙ্কস্ খাবি না। পেট ফুটো হয়ে যাবে', 'রাতে শিস দিবি না। ভূত আসবে', 'চুল ছেড়ে রাতে ঘুরবি না', 'রাতে যেখানে সেখানে হিসু করবি না' ইত্যাদি বাক্যবন্ধ ভয়ের। আসলে 'রাত' মানেই একটা নেগেটিভ এনার্জি। রাতে কেন, দিনেও উচিত নয় যেখানে সেখানে প্রস্রাব করা। জীবাণুর ভয় থাকে আবার পরিবেশও দূষিত হয়। কিন্তু এমনভাবে বললে হয়তো কেউই শুনবে না, তাই রাত বলে খানিকটা ভূতের ভয় দেখিয়ে যদি কাজ হয়।

ভয়ের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে 'ঠাকুরের পাপ লাগবে'। কেউ সরাসরি কোনও কথা না শুনলে বা করলে 'পাপ'-এর ভয় দেখানো হয়। বেশিরভাগ মানুষ ভক্তিতে নয়, খানিকটা ভয়েই ঈশ্বরকে স্মরণ করে। 'হে ভগবান! যেন ফেল না করি', 'ভগবান! ছেলেটার চাকরি পাইয়ে দাও', 'মেয়েটার ভালো ঘরে বিয়ে হলে পুজো দেব', 'ও সুস্থ হলে গণ্ডী কেটে আসব' ইত্যাদি। আসলে এসব কথা ভয় থেকেই সৃষ্টি। এখন তো একরকম ট্রেন্ড হয়ে উঠেছে বাড়ির সামনের পাঁচিল কিংবা ড্রেনে লেখা থাকে, 'এখানে প্রস্রাব করিবেন না'। কেন লোকে এমন বারণ শুনবে? তাই পাশে একটা ঠাকুরের ছবি দিয়ে দেওয়া হয়। এবার সে শুনবে। কারণ এবার তার মনে ভয়, 'ঠাকুরের পাপ লাগবে'।

কখনও আবার ভয় দেখাতে কোনও কথার প্রয়োজন হয় না। কু-ইঙ্গিত কিংবা শব্দই যথেষ্ট। একটি মেয়ের কাছে অপরিচিত ছেলের ঠোঁট কামড়ানো কিংবা চোখের ইশারাই ভয়ের ভাষা হয়ে ওঠে। কেউ আবার ঝড়ের শব্দ কিংবা বাজ পড়ার শব্দে ভয় পায়। কেউ আবার চেঁচামেচিতে ভয় পায়। অনেক সময় ভয় আসে টাকাপয়সা নিয়ে 'এ মাসে ঠিকঠাক সময়ে মাইনেটা পাব তো?' ইত্যাদি। পকেট খালি থাকলে বন্ধুদের 'ধার' চাওয়ার ভয়, 'কিছু টাকা ধার দিবি?' কিছু কিনলে ভয়, 'জিনিসটা ভালো তো', 'আমায় মানাবে তো', 'টিকবে তো', 'টাকাটা বেকার না যায়'।

অনেক সময় ইচ্ছে করেই নিজের স্বার্থে ভয়ের কথা বলা হয়। যেমন— জ্যোতিষীর কাছে গেলে 'তোমার সব ভালো কিন্তু শনির দশা আছে। আংটি পড়তে হবে'। কিংবা ট্রেনে হকার চেঁচায়, 'আর মাত্র একজন পাবেন'। না পাওয়ার ভয়ে লোকে কিনতে দেরি করে না। ডাক্তারের প্রধান অস্ত্রই ভয়ের ভাষা, 'সামনের মাসে আবার চেক আপে আসতে হবে'। হিজড়াদের কাছে 'অভিশাপ' খাওয়ার ভয়। গোপন কথা লোকাতে 'ব্লাকমেইল'-এর ভয়।

চার.

ভয় মানুষের মনেরই দুর্বলতা থেকে সৃষ্টি। যার যেখানে ভয় তার সেই সংক্রান্ত আলোচনা বা ভাষায় ভয়। কেউ 'ভূত' শব্দে ভয় পায়, কেউ খিল্লি করে। কেউ লাউড মিউজিকে নাচে, কারও মাইগ্রেন হয়। কেউ সদ্যোজাত বাচ্চাকে বাইরের খাবার দেয় না। কেউ আবার 'স্তন ঝুলে যাওয়ার' কথায় ভয় পায়। কেউ ভাগ্য মানে না, কারও বা হাতের দশ আঙ্গুলেই আংটি। যার দুর্বলতা যত কম তার কাছে ভয়ের ভাষাও সীমিত। যেমন— কেউ ভয়ের কথা বললে পালটা জবাব আসে, 'বাঙালিকে হাইকোর্ট দেখিয়ো না', 'তুই যে স্কুলে পড়েছিস, তার হেডমাস্টার আমি', 'যা করার করে নিন' 'বাল ছেঁড়া গেল'। স্ত্রীকে স্বামী বা শ্বশুর-শাশুড়ি ভয় দেখিয়ে কিছু বললে সে যখন বলে, 'বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছি।' স্বামীর কাছে এর চেয়ে ভয়ের বোধহয় কিছু নেই। ভয় যেমন ভাষাতেই সৃষ্টি তেমনই ভাষাতেই তার বিলোপ।

ভাষা ও স্বরের বিকৃতিও অনেক সময় ভয়ের উদ্রেক করে। যেমন কোনও মেয়েকে দেখে কেউ যদি বলে 'বাহ! মেয়েটিকে ভীষণ সুন্দর লাগছে' এর উত্তরে সে মুচকি হাসে। একই অর্থে কেউ যদি বলে 'আরে বাস! মালটা হেব্বি তো'। শুনলে ভয় ছাড়া তার মনে আর কিছু আসবে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে ভয় আসে গোপনীয়ভাবে। স্বামী বা স্ত্রী যখন পরকিয়ায় মত্ত হয়, সেখানে ভয়ের ভাষা আসে মনে মনেই, 'ও কিছু জেনে গেল না তো'। আবার অনেক সময় নিরাপত্তাহীনতা, সংযমবোধ ও আবেগজড়িত শব্দেও ভয়ের ভাষা প্রকাশ পায়। যেমন, বিয়ের আগে প্রেমিক প্রেমিকার ভাষা 'হ্যাঁ গো! তোমার বাবা মানবে তো?', 'তুমি ছেড়ে দেবে না তো আমায়?' পুরুষ বেকার থাকলে তার কাছে আবার সবচেয়ে ভয়ের কথা, 'হ্যাঁ গো! বিয়েটা কবে করবে?'

ভয়ের ভাষা কেবল দু'চারটে শব্দ নয়। তা আসলে মনের আবেগ। কখনও সে আবেগ ভাষার সৃষ্টি করে, কখনও আবার ভাষা সেই আবেগের সৃষ্টি করে। কখনও গুণ্ডা-বদমাইশের ভাষায় ভয় সৃষ্টি হয়। কখনও আবার শিক্ষিত মানুষের ইশারাই কাফি। সেক্ষেত্রে ভাষা খানিকটা মনের দর্পণের কাজ করে, যা স্থান-কাল-পাত্রভেদে পরিবর্তনশীল।

৪০৫.৩.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। উদাহরণসহ ভয়ের ভাষার স্বরূপ ব্যাখ্যা করো।

২। ভয়ের ভাষা বলতে কী বোঝো? উদাহরণসহ ভয়ের বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করো।

৪০৫.৩.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত, 'বহুরূপে ভাষা'(প্রথম খণ্ড), ২০১৫, প্রতিভাস, কলকাতা

২। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা'(প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা'(দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে', ২০১৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক-৫

'উদাহরণের ভাষা'

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.৩.৫.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.৩.৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.৩.৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.৩.৫.১ : মুখবন্ধ

উদাহরণের ভাষা বোঝাতে হলে বা বুঝতে হলে উদাহরণ ভিন্ন উপায় নেই। কোনও বিষয়কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার পরও বোধগম্য কোন বাস্তব বিষয়ের উল্লেখ করে উদাহরণ দেওয়া হয়। যেমন— উদাহরণ তার ভাষাও তেমন। উদাহরণ শব্দের অর্থ বোঝাতে দৃষ্টান্ত, নিদর্শন, নজির, বর্ণনাকে বিশদ করার জন্য কোনও বিষয়ের উল্লেখ, উদাহৃত-উদাহরণ রূপে উক্ত, বর্ণিত নানা শব্দ ব্যবহার করেছেন আভিধানিকেরা। ভাষাকে বোধগম্য করার জন্যই বিশদ বিবরণের প্রয়োজন পড়ে। জীবনযাত্রাকে সহজ করার জন্যেও উদাহরণ খুবই প্রয়োজনীয়। এ বিষয়ে মতের তারতম্য ঘটার অবকাশ নেই। এই কারণে গড়ে ওঠে উদাহরণের নিজস্বতা। যাকে উদাহরণের ভাষা বলা হয়। এই যেমন ধরা যাক 'যথা', 'যেমন', 'যেন' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে যখন প্রাত্যহিক জীবনের প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন বাক্য তৈরি করা হয়। অবলীলায় তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না উদাহরণের ভাষা আমাদের জীবনে অজ্ঞাতসারে জায়গা করে নিয়েছে।

এক.

সব কথার ক্ষেত্রেই শ্রেণি ও অবস্থান অনুযায়ী মানুষে মানুষে পার্থক্য দেখা যায়। একই রকম ভাবে শব্দ নির্বাচন ও কথন ভঙ্গিমার পার্থক্য অনুযায়ী প্রকাশভঙ্গিও বদলে যায়। উদাহরণের ভাষা স্বভাবতই প্রয়োজন অনুসারে গঠন করা হয়। এবং তা স্বাভাবিক ভাবেই সহজ হয়। বোধগম্য হয়। যখন কোন তাত্ত্বিক বিষয়ে উদাহরণ দেওয়া হয় তখন

উদাহরণের ভাষা হয় তত্ত্বে বর্ণিত বিষয়বস্তুর থেকে সহজ ও বাস্তবমুখী। যা সহজে বোধগম্য হয়। যখন কোনও বিস্তারিত বিষয়ে সহজ করে উদাহরণ দেওয়া হয় তখনই জন্ম নেয় বাগধারা, এক কথায় প্রকাশ, সমাস, সন্ধির মতো একাধিক বিষয়। এদের উদাহরণে ব্যাকরণ বইগুলি ভরে উঠেছে। উদাহরণ সহজ হওয়ায় মানুষের তত্ত্ব বা মূল বিষয় মনে রাখতে সহজ হয়েছে।

উদাহরণকে একপ্রকার তুলনা বলা যেতে পারে। এর সঙ্গে তার তুলনা। তাত্ত্বিকভাবে তুলনা বোঝাতে বলা যায় এটা হল সেই বিচার পদ্ধতি যা আমাদের প্রতি মুহূর্তকে নিয়ন্ত্রণ করে, নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের বেঁচে থাকাকে। কী পড়ব, কী খাব, কী পরিধান করব, কোথায় যাওয়া উচিত—কোথায় যাওয়া অনুচিত, কোন রেস্টুরেন্টে খাব, কোন ক্যাফেতে আড্ডা দেব, টিউশন পড়ার মাস্টারমশাই বা কোচিং নির্বাচন থেকে পার্লার নির্বাচন, বিয়ের সম্বন্ধ নির্বাচনের ক্ষেত্রের পাশাপাশি উপরিউক্ত সমস্ত উদাহরণ তুলনা পদ্ধতি ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে অপারগ হই আমরা। আর এখানেই আটকে গেছে উদাহরণের প্রাসঙ্গিকতা। ইতিহাসের নজির থেকে বরাবর আমরা শিক্ষা নিই। তা না হলে ভুলে ভুলে ভরে যেত আমাদের জীবন। তাই উদাহরণের অপরিহার্যতা আমরা অস্বীকার করতে পারি না কোনও ভাবেই। আগের ভুল সিদ্ধান্ত, ভুল কাজের উদাহরণ আমাদের বর্তমানকে শুধরে দেয়। অঙ্ক বইয়ের দেওয়া উদাহরণ আমাদের অঙ্ক বুঝতে যেমন সাহায্য করে তেমন করে কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অঙ্ক বুঝতে প্রয়োজন হয় বাস্তব অভিজ্ঞতা। এটা উদাহরণে সাহায্যে বিষয়টা বুঝে নেওয়া যায়বন্ধুদের পিকনিকে মুরগির মাংস আনতে বাজারে যাওয়া ছেলেটি যদি খাতা নিয়ে অঙ্ক কষে হিসাব করে নিয়ে আসে তাহলে সেটা বাস্তব পরিস্থিতে হাস্যকর হয়ে ওঠে। এই জন্য তাকে বাস্তব পরিস্থিতে মাঝে মধ্যেই বাজার যেতে হবে এবং মুখে মুখে হিসেব করা শিখে নিতে হবে।

দুই.

মিরান্দার সঙ্গে দেস্‌দিমোনার তুলনা, দেস্‌দিমোনার সঙ্গে শকুন্তলার তুলনা প্রসঙ্গ এনে বঙ্কিমচন্দ্র তুলনামূলক সাহিত্য পাঠের যে পদ্ধতি এদেশে চালু করে গিয়েছেন তা পরবর্তীকালে জনপ্রিয় হয়েছে। এবং তার অনেক উদাহরণ রয়েছে। তুলনামূলক পদ্ধতির ব্যাপারটা এখন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের পঠনপাঠনের মাধ্যমে এসেছে। এই একাডেমিক ডিসিপ্লিনারির মধ্যে চলতে হয় আমাদের মতো শিক্ষকদের। লড়ে যেতে হয় কলম পেশা মজুরের মতো, সুবক্তার মতো। বাড়িতে, বাসে, ট্রেনে, ট্রামে, ক্লাসরুমে, ডায়াসে যেখানে যেখানে আমরা বক্তার আসন অলংকৃত করি সেখানে আপ্রাণ চেষ্টা করি নিজের মতকে প্রমাণের। আর প্রমাণ করতে প্রয়োজন উদাহরণের।

প্রতি মুহূর্তে চমস্কির রূপান্তরমূলক-সৃজনমূলক মতের প্রতিষ্ঠা করতে সৃষ্টি করা হয় অনেক নতুন বাক্যের। বাক্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে উদাহরণের। এ ছাড়া প্রতিনিয়ত উদাহরণের পাহাড় প্রশ্ন-উত্তরের উদাহরণ, উদাহরণের ভাষা স্বরূপ উন্মোচিত করে চলেছে। এক পার্টির মতের সমর্থন করতে অন্য পার্টির অপকীর্তির উদাহরণ। খেলোয়ারদের ভালো-মন্দর দক্ষতা বোঝাতে একের সঙ্গে অন্যের খেলার দক্ষতার তুলনামূলক উদাহরণ। সামাজিক অবক্ষয়ের উদাহরণ দিতে মেয়েদের পোশাক পরার রুচির উদাহরণ দিয়ে থাকেন অনেকে। বিনয় প্রদর্শনের উদাহরণ, ভাট বকার উদাহরণ, রাগ প্রকাশের, দুঃখ প্রকাশের, আনন্দ প্রকাশের, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের, ভালবাসা নিবেদনের, ঘৃণা দেখানোর—প্রতি ক্ষেত্রেই উদাহরণের ভাষা বদলে যায় পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী।

সাহিত্য পড়াতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ‘চোখের বালি’-এর সঙ্গে তুলনা করা হয় উপন্যাসের। কবিদের কবিতার ক্ষেত্রেও তাঁদের দরকার হয় ‘উপমা’-র। ‘ন্যায়’, ‘মতো’, ‘যথা’, ‘যেমন’, ‘যেমতি’, ‘যেন’ ইত্যাদি। তবে এসবের বিস্তারিত আলচনার জন্য রয়েছে শ্যামাপদ চক্রবর্তীর ‘অলঙ্কার চন্দ্রিকা’ গ্রন্থটি।

তিন.

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, উদাহরণের ফাঁদ পাতা রয়েছে পৃথিবীর সর্বত্র। এর জালে ধরা না পড়ে উপায় নেই। এই উদাহরণের জালে জড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বাগধারা আবার কখনও কখনও তা হারিয়ে যাচ্ছে কালের নিয়মে। কোন শিক্ষক কতটা দক্ষ সেই স্থান নির্ধারণ হয় উদাহরণ সহযোগে পাঠ্য বিষয়ের যিনি যত বেশি প্রাঞ্জল, বোধগম্য ভাষায় তুলে ধরতে পারেন। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার প্রথম পর্যায়েই আমরা উদাহরণ শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হয়ে যায় সকলে। যেমন কয়েকটা লাল ফুল, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণি, পশু বা কয়েকটা সরীসৃপ প্রাণির উদাহরণ দাও। এই ধরনের প্রশ্নোত্তর পর্বে সেই শিশু বেলা থেকেই অভ্যস্ত হতে থাকি। সেই থেকে উদাহরণের পর উদাহরণ ছাত্রজীবনে মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হতে থাকে। 'সংজ্ঞাসহ উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও' এ যেন পুরো ছাত্রজীবন জুড়ে বিরাজ করে। বিষয়টা পরীক্ষা নামক বিভীষিকার মধ্যে দিয়ে বুঝে নেওয়া যাক। পরীক্ষার খাতা একেই উদাহরণের ছড়াছড়ি। সঠিক সময়ে সঠিক উদাহরণ মনে পড়াটাও চাপের বিষয়। তারপরে পরীক্ষায় ফল খারাপ করলে চর্চা পড়ে সঙ্গে বাবা-মায়ের দেওয়া উদাহরণগুলি নক্ষত্রের মতো এখনও জ্বলজ্বল করে। ক্লাসের ভালো ছাত্র বা পাশের বাড়ির মেয়েটির ভালো ফলের নমুনা বা পিসির ছেলের বিদেশে যাওয়ার উদাহরণের চোটে অস্থির হয়ে যায় কিছু শিক্ষার্থী।

ছোটবেলায় দুষ্টুমি করলে রূপকথা গল্পের ভালো শান্ত ছেলের উদাহরণ। বড় বড় মনীষীর বাণীর উদাহরণ। আর ভয় দেখানোর জন্যে ভয়ানক জন্তুর উদাহরণ দিয়ে গল্প শোনানো। ছোটবেলায় পুলিশের ভয় দেখিয়ে অন্যায়ের শাস্তি দেওয়া। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা সন্ধানের সংগ্রামের উদাহরণে তোলপাড় হয়ে যায় নিউজ পেপার, টেলিভিশন চ্যানেল, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি। ভালো করে পড়াশোনা না করলে, চাকরি না পেলে বিয়ে তো দুরস্ত একটা প্রেম পর্যন্ত হবে না এমন সব উদাহরণের নজির প্রচুর। ঠিক সময় রাতে না ঘুমোলে কী কী রোগ বা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে তার উদাহরণ বর্তমান সময়ে খুবই জনপ্রিয় উদাহরণ। ডিপ্রেশন, ফোন আসক্তি, খিটখিটে মেজাজ, আত্ম সংযমহীনতা, আত্ম সর্বস্বতার উদাহরণ বর্তমান সময়ে ভরি ভরি। সার্ভে করলে দেখা যাবে যে প্রায় প্রতিটি পরিবারে এরকম মানুষের উদাহরণ কমবেশি রয়েছে।

ফুলিয়ার শাড়ি ভালো এবং সস্তা সেই উদাহরণ স্থানীয় শাড়ির দোকানে না দিলে দর কষাকষি করতে যেন মজাই পাওয়া যায় না। বাড়ির সামনে সবজিওয়ালার সঙ্গে দর কষাকষি করতে গিয়ে বড় বাজারের উদাহরণ না দিলে যেন সম্মানহানি হয়। সৌরভ কেন প্রিয় খেলোয়ার সেটা বোঝাতে শচীন যেন কেমন খেলছেন ইত্যাদি কথা চলে আসে। আবার এখনকার খেলোয়ারদের সেই প্যাশান নেই এই ধরনের উদাহরণ বাজারে খুবই সহজলভ্য। করোনার সময় সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে এক দল শিল্পী গড়ে ওঠে। যেমন—বাচিক শিল্পী, সংগীত শিল্পী, নৃত্য শিল্পী, অঙ্কন শিল্পী, রন্ধন শিল্পী ইত্যাদি। তবে এদের শিল্পগুণ বিচার সাপেক্ষ। আগেকার দিনের গানের সঙ্গে এখনকার গানের তুলনা করলে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সেক্ষেত্রে উদাহরণও অনেক রয়েছে। এখনকার তুই-তোকারি সম্বোধনযুক্ত গানের উদাহরণ প্রচুর রয়েছে। আগে এমনটা ভাবা যেত না। সুরের ঝংকারে মন দুলে উঠত। এই সময়ের বেশিরভাগ গান আখ্যানধর্মী। বড়বাবু যে কতো খারাপ লোক তা অন্য অফিসের বড়বাবুর মহানুভবতার উদাহরণ অনন্য হয়ে রয়েছে। এক পরীক্ষার্থী কেন বেশি নম্বর পেল তা অন্য পরীক্ষার্থীর হাতের লেখা ও বিষয়ের উদাহরণ দিয়ে শিক্ষক দেখান অনন্য ছাত্রছাত্রীদের ভাল নম্বর কীভাবে পেতে হয়।

এক পত্রিকার সঙ্গে অন্য পত্রিকার লেখার গুণগত মান তুলনা না করে বোঝা যায় না কোন পত্রিকা প্রতিদিন পড়া উচিত। কেমন লেখার কৌশল রপ্ত করার জন্য আমাদের প্রতিদিন সংবাদপত্র পাঠ করা উচিত। তেমনি প্রয়োজন

বাংলা বই পড়া। 'সংসদের বাংলা অভিধান', 'অকাদেমির বানান অভিধান'-এর পাশাপাশি 'লেখক সম্পাদকের অভিধান' 'কী লিখব কেন লিখব'—এই বইগুলি ছাড়া শুদ্ধ বাংলা লেখা রপ্ত করা সহজ নয়। এসব তো গেল লেখা শেখার জন্য বইয়ের উদাহরণ। তবে কিছু শব্দ আছে যেগুলি আমাদের অজস্র উদাহরণ দেওয়ার হাত থেকে বিশ্রাম দিয়েছে। সেগুলি হল ইত্যাদি, প্রভৃতি, প্রমুখ, বিবিধ ইত্যাদি।

উদাহরণের পৃথিবী আসলে অনেকটা অক্সিজেনময় বায়ুমণ্ডলের মতো। আমরা সেখানে ভাসছি নাকি অক্সিজেন নিচ্ছি তা কার্যকারণ সম্পর্কে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছে সেটা বোঝাই যায় না। তেমনই উদাহরণসর্বস্ব আমরা এইভাবে গোটা জীবন কাটিয়ে দিই যার প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ধারিত হচ্ছে নানাবিধ উদাহরণের অচ্ছেদ্য কম্পাসে। জীবনের দাঁড়িপাল্লায় চাপানো আছে নানা রকমের উদাহরণ। সেগুলি সবই তৈরি হয়েছে ভাষা দিয়ে।

৪০৫.৩.৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১) উদাহরণের ভাষার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে এই ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করো।

২) উদাহরণের ভাষা বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ এই ভাষার পরিচয় দাও।

৪০৫.৩.৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১) শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত, 'বহুরূপে ভাষা' (পঞ্চম খণ্ড), ২০১৯, প্রতিভাস, কলকাতা

২) ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩) ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪) ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫) শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে', ২০১৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৩

একক-৬

‘বাংলা প্রশ্নপত্রের ভাষা’

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.৩.৬.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.৩.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.৩.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.৩.১.১ : মুখবন্ধ

প্রশ্নপত্র মানেই বয়ানের মধ্যে থাকবে স্পষ্টতা। ভাষা হবে ঋজু, সহজ-সরল। প্রশ্নকর্তার উদ্দেশ্য কী অর্থাৎ তিনি ঠিক কী জানতে চান তা পরীক্ষার্থীর কাছে স্পষ্ট হওয়া চায়। কিন্তু তাই বলে এটা কখনওই কাম্য নয় যে প্রশ্ন হবে নান্দনিকতা বিমুখ। পরীক্ষার্থীর মনন, চিন্তন, বোধের কাছে প্রশ্নকর্তা যেমন আবেদন রাখেন তেমনই একজন প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের মধ্যেও নান্দনিক বোধ থাকা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু আমরা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষায় করা প্রশ্নপত্রের মধ্যে দেখতে সেই একঘেয়ে গতানুগতিক শব্দ বা শব্দবন্ধ আলোচনা করো, যা জানো লেখো, ব্যাখ্যা করো, বিশ্লেষণ করো ইত্যাদি শব্দবন্ধ। আসলে সেই একই কথা। পোশাক বদলে বদলে অন্যরূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা মাত্র। তার মধ্যে না আছে শিল্পরূপ, না আছে নান্দনিক বোধ।

এক.

ভারতবর্ষ বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জ্ঞান বিতরণের পরিমণ্ডলে প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষার্থীর অবস্থান একই সমতলে আনার প্রচেষ্টা চললেও তা এখনও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। সে কারণেই প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষার্থীর মধ্যে দূরত্ব থেকে যায়। কোনও প্রশ্নকর্তা যখন প্রশ্ন করেন অমুক গল্পের নামকরণের সার্থকতা লেখো তখন পরীক্ষার্থীকে জোরপূর্বক বলেই দেওয়া হয় নামকরণ সার্থক হয়েছে সেটাই প্রমাণ করতে হবে। আমাদের পরীক্ষা ব্যবস্থার ক্ষমতা বিন্যাসে প্রশ্নকর্তার উচ্চাসন লাভেরই প্রমাণ এই ধরনের প্রশ্ন। এই আধিপত্যের জন্যই

তিনি পরীক্ষার্থীকে 'মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করো', 'সার্থকতা বিচার করো', 'গুরুত্ব আলোচনা করো', 'তাৎপর্য লেখো', 'বুঝিয়ে দাও' ইত্যাদি রকমের প্রশ্ন করে থাকেন।

উঁচু ক্লাসের পরীক্ষার ক্ষেত্রে সাহিত্যে যথাযথ উত্তর বলে কিছু হয় না। ছোটদের ক্ষেত্রে হলেও সেখানে বড়দের ক্ষেত্রে মোটিভটাই সম্পূর্ণ আলাদা। যথাযথ শব্দের কোনও মানেই হয় না। এখানে প্রশ্নকর্তা পরীক্ষার্থীর Knowledge অপেক্ষা স্বাধীন চিন্তাভাবনার কাছে আবেদন রাখেন। তাই যখন কোনও প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করেন অমুক নাটকের হাস্যরস আলোচনা করো, তখন মনে হয় তিনি নাটকটিতে প্রভূত হাস্যরসের সন্ধান পেয়েছেন এবং পরীক্ষার্থীর সমর্থন চাইছেন। এক্ষেত্রে ত্রুটি ঘটতে পারে। হয়তো ঘটনা পরম্পরায় হাস্যরসের উদ্রেক হলেও নাটকটিকে সেভাবে হাস্যরসের নাটকই বলা যায় কি না তা বিচার্য। পরীক্ষার্থীকে আলোচনা সামগ্রিকভাবেই করতে হয়। সেক্ষেত্রে তার নিজস্ব মত প্রকাশের অবকাশই থাকে না। আবার প্রশ্নকর্তা যদি এভাবে প্রশ্ন করেন অমুক নাটকের ঘটনা পরম্পরায় এমন কিছু মুহূর্ত আছে যা পাঠকের হাস্যরস উদ্রেক করতে পারে। তাহলে কি এই নাটকটিকে হাস্যরসাত্মক নাটক বলা চলে তোমার কী মনে হয়? তার সপক্ষে লেখ?এ প্রশ্ন হয়তো মডারেশন বোর্ডের অনুমোদন পাবে না। প্রশ্নকে একমাত্রিক করে তোলাই তাদের লক্ষ্য। আবার বর্তমানকালে লক্ষ করা যাচ্ছে বাংলা প্রশ্নপত্রের ভাষাতেও স্বাধীন মতামত দেওয়ার বিষটিকে গুরুত্ব না দিয়ে এক কথায় উত্তর দেওয়ার বিষয়টিকে প্রশ্নপত্রে দেওয়া হচ্ছে। যেমন—'কত সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পেয়েছেন?' 'রামমোহন রায়ের বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থের নাম কী?' অথবা 'বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা প্রথম উপন্যাসটির নাম কী?' উল্লেখ্য, এইসব প্রশ্ন ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীন চিন্তা প্রকাশের পরিবর্তে মুখস্থ বিদ্যাকেই গুরুত্ব দিচ্ছে।

অন্যদিকে প্রশ্নকর্তা বাংলা প্রশ্ন করে নিজের অজান্তেই প্রশ্নের মধ্যে উত্তর প্রত্যাশা করে ফেলেন। প্রশ্নের বয়ান এমন হয় যার মধ্যে অন্তঃশীল আধিপত্য চলে আসে। আর আধিপত্য কোনওভাবেই কাম্য নয়, বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে। গঠন কৌশল, ভাষা সংলাপ, নামকরণের সার্থকতা, চরিত্রের গুরুত্ব, বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রশ্নে এই ধরনের অনুকরণবৃত্তি সত্যিই ক্লিশে মনে হয়। শিক্ষার্থী কতটা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারে, তার শেখা বিদ্যাকে প্রয়োগ করতে পারে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে এটাই প্রাধান্য পায়। সে জন্যই প্রশ্নকর্তাকে গতানুগতিক প্যাটার্ন থেকে বেরিয়ে আসা খুব প্রয়োজন। কিন্তু সেই চিন্তাচেতনা প্রশ্নকর্তার মধ্যে বিশেষ লক্ষ করা যায় না।

দুই.

গতানুগতিক প্রশ্নপত্রের সমান্তরালে বাংলা প্রশ্নপত্র সম্পর্কে আরেকটি বিষয় আমাদের সামনে আসে তা হল পাঠক্রম। পাঠক্রমের কাঠামোগত মিলের সঙ্গে প্রশ্নপত্রের কাঠামোগত মিলের একটা সম্পর্ক আছে। উচ্চতর বাংলা বিদ্যাচর্চার পাঠক্রমের প্যাটার্ন ও প্রশ্নপত্রের প্যাটার্নের খুব একটা বদল হয়নি। তবে সিলেবাস নিয়ে আলোচনা হলেও প্রশ্নপত্র নিয়ে তো একেবারেই কোনও আলোচনা হয়েছে বলে শোনা যায় না। তাই প্রশ্নপত্রের প্যাটার্ন বদলাতে হলে বদলাতে হবে অনেক কিছুই। পাঠক্রম রচনার প্রেক্ষাপট, দৃষ্টিভঙ্গি, পঠনপাঠন পদ্ধতি এরকম আরও কিছু বিষয়ে বদল আনতে হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমশাই-ই সহজাত প্রশ্নকর্তা। মডারেশন বোর্ডও তার উপর খবরদারি করাকে সৌজন্য মনে করে না। প্রকৃতপক্ষে ওই প্রশ্নের উপর খানিকটা পালিশ করা ছাড়া মডারেশন বোর্ডেরও তার বেশি অধিকার থাকে না। আসলে এর মূলে আছে পরীক্ষায় রেজাল্ট করার বিষয়টি। পড়াশোনা আর যান্ত্রিক পদ্ধতি পাশ-ফেল, নম্বরের গুরুত্ব, পাঠক্রম শেষ করা এই সব কিছুকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে শিক্ষকেরা ক্লাসে যে আলোচনা করেন, তা থেকেই প্রশ্ন আসে। প্রশ্নের মান বলেও যে একটা কথা আছে তা তিনি মনেই করেন না। তার উপর আবার ভুল

বানান, ভুল বাক্য, Proper word in proper place বলেও একটা কথা আছে। সেই শব্দ প্রয়োগেও ত্রুটি দেখা যায়। বাংলা ভাষাতত্ত্বচর্চায় সুকুমার সেনের অবদান লেখ, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাব্যমূল্য নিরূপণ করা ইত্যাদি প্রশ্নে কর, লেখ বানানগুলি যথার্থ নয়। নির্দেশমূলক বাক্যে ক্রিয়া পদের বানান 'ও'-কারান্ত হয়। অর্থাৎ করো, লেখো, বলো ইত্যাদি হবে। আরও একটি বানান ভুল আমাদের প্রায়শই চোখে পড়ে। কলকাতার একটি নামী কলেজের (২০১৮) একটি স্নাতকোত্তর বাংলা প্রশ্নে সমস্ত 'কী' বানানের জায়গায় কি লিখেছেন প্রশ্নকর্তা উপন্যাস সাহিত্যকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় কী ও কি কি? শ্রীরাম পাঁচালীর মূল বিষয় কি? এখানে কী হওয়াই কাম্য। অব্যয়পদ 'কি' আর সর্বনাম 'কী' যদি প্রশ্নকর্তার ক্ষেত্রেই একাকার হয়ে যায় তাহলে শিক্ষার্থীই বা কি শিখবে। আবার একটি প্রশ্নে, গোবিন্দদাস-কে বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা যায় কি? প্রশ্নটিতে গোবিন্দদাসও 'কে' বিভক্তির মধ্যে হাইফেন(-) দিয়েছেন প্রশ্নকর্তা অথচ বিভক্তি মাত্রই শব্দের সঙ্গে জুড়ে থাকবে।

তিন.

ভাষার সঙ্গে চিন্তার যোগ প্রবল। চিন্তাকে কোনওভাবেই ভাষার থেকে আলাদা করা যায় না। পাশ্চাত্য দার্শনিকরা সেই কবেই বলে গেছেন ভাষা হল চিন্তার পোশাক। যে কোনও প্রশ্নকর্তার চিন্তন সামর্থ্য, চিন্তার গভীরতা থাকা বাঞ্ছনীয় প্রশ্নের বয়ানে। যে কোনও লেখক বা বক্তার ভাষিক বয়ানে যথার্থ শব্দের প্রয়োগে যেমন তাঁর ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত করে, তেমনই সুযোগ্য প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের বয়ানের মধ্যে তাঁর নিজস্ব সত্তার বহিঃপ্রকাশ জরুরি। একজন আদর্শ প্রশ্নকর্তা কেমন হবেন এক্ষেত্রেও তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের স্বরূপ তার জাদুকাঠির স্পর্শে উন্মুক্ত হয়েছে পাঠকের কাছে। বাংলা সাহিত্যের প্রশ্ন ঠিক কেমন হওয়া উচিত, তার আদর্শ প্রতিমান তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন।

রবীন্দ্র রচনাবলীতে 'আদর্শ প্রশ্ন' নামে একটি বিষয় সংকলিত আছে। শান্তিনিকেতনের পাঠভবনের ছাত্রদের জন্য বাংলা পাঠ্যপুস্তকে যে প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন সেগুলিরই সংকলন 'আদর্শ পাঠ'। 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের প্রশ্ন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "বাঙালী মেয়ের সহিত কাবুলিওয়ালার স্নেহসম্বন্ধের ভিত্তিটি কোন্‌খানে। কাবুলিওয়ালার সঙ্গে কখন কী রকমে মিনির পরিচয় আরম্ভ হোলো।" আবার প্রশ্নপত্রের শিরোনামে লিখে দিতেন 'এইসব প্রশ্নের উত্তর বই থেকে লিখলে আপত্তি নেই। লিখতে হবে নিজের ভাষায়।' তিনটি বাক্য প্রথম বাক্যে বিবৃতি, দ্বিতীয় বাক্যে নির্দেশ, তৃতীয় বাক্যে সূত্র। বিষয়টা সম্পূর্ণই মনস্তাত্ত্বিক। না আছে প্রশ্নকর্তার আধিপত্য। না আছে জিজ্ঞাসা চিহ্নের সঠিক লেখার ভঙ্গি। বয়ানের মধ্যে একটা নম্রভাব আছে। আবার পরীক্ষার্থীদের বিদ্যাচর্চা কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে তা জানতেও কোনও খামতি হবে না। এত বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যা পেরেছিলেন এতদিন বাদেও আমরা তা পারছি না। অথচ ছাত্র শিক্ষকের সমতা তথা শিক্ষার্থীকে গুরুত্ব দেবার কত আয়োজনই না চলছে। অথচ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও এটাই তো কাম্য। হয়তো আমাদের চলতি সিস্টেম এটাকে সাপোর্ট করবে না। কেন যে করবে না সেটাই একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন।

প্রশ্নপত্রের মধ্যেও যে নান্দনিক রূপ থাকা জরুরি রবীন্দ্রনাথ তা আমাদের দেখালেন। আশার কথা এটাই যে কোনও কোনও প্রশ্নকর্তার প্রশ্নের মধ্যে চিন্তাভাবনার গভীরতা প্রকাশ পাচ্ছে। অধিকাংশই যখন গতানুগতিকতার জোয়ারে গা ভাসাচ্ছে সেখানে কারও কারও প্রশ্নের মননশীলতার ছাপ মনে আশার আলো জাগায়। তারা উদ্ধৃতি তুলে পরীক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তা জানতে চান, পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি চান। এক কথায় পরীক্ষার্থীর চিন্তন সামর্থ্য বুঝতে চান। "আমাকে কি তুমি খুঁজেছ দেশ জুড়ে?/ তবু পাওনি? তাহলে ফিরেছ ভুল পথে ঘুরে ঘুরে" উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে তোমার ভাবনা বিস্তারিত লেখ। তবে এরও যদি পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে তাহলে সেটাও একঘেয়ে ও গতানুগতিক

হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগবে না। তাই প্রশ্নকর্তাকেও ভাষা নির্মাণে প্রচলিত রীতি থেকে সরে এসে পরিচয় দিতে হবে উদ্ভাবনার।

চার.

আসলে গতানুগতিকতার সঙ্গে চলতে থাকে নোট পড়ার বিষয়টা। সেই নোট নির্ভরতা পরীক্ষার্থীর চিন্তন ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়। নোট নির্ভরতা চাইবে 'দেবযান' উপন্যাসের পরাবাস্তবতা সংক্ষেপে লেখো। বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের অবদান লেখো। 'মুক্তধারা' নাটকের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো। কিন্তু প্রশ্নকর্তাকে সজাগ থাকতে হবে, প্রশ্নের ভাষিক বয়ানের শিল্পরূপ নির্মাণের উপর। পরীক্ষার্থীর মুখস্থ বিদ্যার উপর আশা না রেখে পরীক্ষার্থীর মেধা, পরীক্ষার্থীর বোধ, চিন্তন ক্ষমতার উপর আবেদন রেখে সৃজনশীল প্রশ্ন করা উচিত। মুখস্থ বিদ্যার পাশ-ফেল নম্বরের মাতামাতির মধ্যে দাঁড়িয়েও কেউ কেউ যখন প্রশ্ন করেন 'সুভা' গল্পে মূক বালিকার সহিত মৌন বিরাট প্রকৃতির নিগূঢ় ঐক্যের পরিচয় আগাগোড়া পরিপূর্ণ গল্পে প্রকৃতির সঙ্গে সুভার একাত্মতাকে স্মরণে রেখে বিষয়টি যুক্তিসহ উপস্থাপন করো।

নোট-সর্বস্বতার ভিড়ে এ ধরনের প্রশ্ন আশার আলো। নোট-সর্বস্বতা চাইবে সুভা চরিত্রটির বিশ্লেষণ ও 'সুভা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা। এগুলির থেকে উপরিউক্ত প্রশ্নটি অনেক উচ্চ মানের। তবে এটাও খেয়াল রাখতে হবে প্রশ্নেরও পুনরাবৃত্তি চলতে থাকলে একঘেয়ে হতে সময় লাগবে না।

রবীন্দ্রনাথের তৈরি 'আদর্শ প্রশ্ন' আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় প্রশ্নপত্রের ভাসিক বয়ান কতটা নম্র হওয়া উচিত। কেবলমাত্র সিলেবাস নিয়ে ভাবনাচিন্তাই নয়, পাশাপাশি বাংলা প্রশ্নপত্রের ভাষা কেমন হওয়া উচিত সে বিষয়ে সজাগ হওয়ার সময় এসেছে।

৪০৫.৩.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. প্রশ্নপত্রের ভাষা বলতে কী বোঝো? উদাহরণসহ বাংলা প্রশ্নপত্রের ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি নিরূপণ করো।

২. বাংলা প্রশ্নপত্রের ভাষার স্বরূপ আলোচনা করে উদাহরণসহ এই ভাষার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৪০৫.৩.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত, 'বহুরূপে ভাষা' (চতুর্থ খণ্ড), ২০১৭, প্রতিভাস, কলকাতা

২. ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩. ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪. ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫. শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে', ২০১৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-১

‘দ্বিতীয় ভাষা’

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.৪.১.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.৪.১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.৪.১.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.৪.১.১ : মুখবন্ধ

মাতৃভাষা তথা প্রথম ভাষা শেখার পর অন্য কোনও ভাষা শিক্ষাকে দ্বিতীয় ভাষা বলে। মূলত বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে প্রথম ভাষা এবং দ্বিতীয় ভাষা—এইভাবে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। অবশ্য সে ক্ষেত্রে মাতৃভাষাই যে প্রথম ভাষা হতে হবে, তার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে স্বভাবতই ইংরেজিকে প্রথম ভাষা হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে মাতৃভাষা বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে। তবে সেখানেও ব্যতিক্রম রয়েছে। দেশের হিন্দি বলয়ে তো বটেই, তার বাইরেও ইদানিং হিন্দি ভাষাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। এর কারণ হিসেবে উঠে আসে পরবর্তীকালে কর্মক্ষেত্রে নানান সুযোগ সুবিধা পাওয়ার বিষয়টি। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষা হিসেবে ইংরেজির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এদিকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কাজের সন্ধানে পাড়ি দেওয়া শিক্ষার্থীদের কাছে হিন্দি ভাষার গুরুত্বও দিন দিন বাড়ছে। ফলে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়া সত্ত্বেও তা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নেওয়ার সংখ্যা দিন দিন কমছে।

আগে স্কুলের পরীক্ষার মার্কশিটে প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় ভাষার জায়গায় লেখা থাকত Vernacular I ও Vernacular II। এখনও কোনও কোনও বোর্ডের রেজাল্টে এটি লেখা হয়। এই Vernacular শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল— ‘The language spoken by the ordinary people of a country or region.’ আগে সাধারণত

Vernacular I হিসেবে মাতৃভাষা এবং Vernacular II হিসেবে ইংরেজি নেওয়ার প্রচলন ছিল। এখন অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বিপরীত মনোনয়ন দেখা যায়। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বদল আজকাল পরিলক্ষিত হয়। আগে মাতৃভাষার মাধ্যমে ইংরেজি শেখানো হতো। এখন ইংরেজি প্রথম ভাষা হিসেবে পরিগণিত হওয়ায়, একদম শৈশব থেকেই সরাসরি ইংরেজিতে শিক্ষাদান করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে আসে। তা হল—মাতৃভাষা কি কখনও দ্বিতীয় ভাষা হতে পারে? বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে কিন্তু ভারতবর্ষে এই চিত্রই প্রায় সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। শুধু দ্বিতীয় ভাষা নয়, পশ্চিমবঙ্গের কথা যদি ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে বাংলা ক্রমশ কোণঠাসা হতে হতে দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদাও হারাচ্ছে। এমন ঘটনাও দেখা গেছে যে, পশ্চিমবঙ্গেরই একটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে কোনও শিক্ষার্থী দ্বিতীয় ভাষা হিসেবেও বাংলা না নেওয়ায় বাংলার শিক্ষিকার চাকরি চলে গেছে। এই নিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে কিছু আলোচনা সমালোচনা হয়েছে বটে, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যথারীতি তা থিতিয়েও পড়েছে। আর শুধু স্কুলই বা কেন? অনেক কাস্টমার কেয়ার বা কল সেন্টারে ইংরেজি ও হিন্দিভাষী কর্মী রাখা হচ্ছে। কারণ হিসেবে বলা হয়, বাংলা ভাষায় কেউ ফোন করে কথা বলতে চাইছে না বা বাংলাভাষী প্রতিনিধির খোঁজ সেভাবে কেউ করছে না। তাই খরচ সংকুলানের জন্য বাংলায় উত্তর দেওয়া কর্মীর ওপরেই সর্বপ্রথম কোপটি পড়ছে।

এই যে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবেও খোদ বাংলায় বাংলা ভাষা মর্যাদা হারাচ্ছে, এর জন্য কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরাও সমান দায়ী। অন্যান্য ভাষার আগ্রাসন তো প্রতিটি ভাষার ওপরেই কমবেশি নেমে আসে। কিন্তু আমরা বাঙালিরা যেভাবে নিজের মাতৃভাষাকে অবহেলা করি, তেমনটি কিন্তু অন্যান্য ভাষার ক্ষেত্রে সচরাচর দেখা যায় না। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে, বিশেষ করে তামিলনাড়ু, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকে যথাক্রমে তামিল, মালয়ালাম, তেলেগু এবং কন্নড় ভাষা প্রচলিত। নবনির্মিত তেলেঙ্গানাতেও তেলেগু ভাষারই প্রচলন। এইসব রাজ্যে কিন্তু তাদের মাতৃভাষাকে যথোচিত মর্যাদার সঙ্গেই ব্যবহার করা হয়। কি শিক্ষাঙ্গনে কি কর্মক্ষেত্রে, সর্বত্রই ইংরেজির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ভাষাকে নির্ভুল ও বহুলভাবে বলা এবং লেখা হয়ে থাকে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতেও হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি, পঞ্জাবি ভাষাভাষীর মানুষেরা তাদের মাতৃভাষাকে সম্মানের ও গর্বের সঙ্গেই জীবনযাপনের অঙ্গীভূত করে রেখেছে। কেবলমাত্র বাংলাতেই এই অবনমন সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। অথচ এই বাংলা ভাষার জন্যই ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) আবুল বরকত, রফিক উদ্দিন আহমেদ, আবদুস সালাম, আবদুল জব্বার প্রমুখরা প্রাণ দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় আয়রনি বোধহয় এখানেই যে, এই দিনটির গুরুত্ব অনুধাবন করে রাষ্ট্রপুঞ্জ এটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। অথচ আমরা, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরাই মাতৃভাষাকে ক্রমশ বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দিচ্ছি।

এই অবহেলার শেকড় খুঁজতে গেলে আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে। ইংরেজরা এই দেশে আসার পর থেকেই কিন্তু এই বিদেশী ভাষা শেখার ও জানার প্রয়োজনীয়তা বাড়তে থাকে। মূলত চাকরি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ইংরেজি চর্চার সূত্রপাত ঘটে। টমাস ব্যারিংটন মেকলে যে শিক্ষানীতি প্রচলন করেন, তা ছিল সম্পূর্ণতই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তখন থেকেই ইংরেজি পড়তে, বলতে ও লিখতে পারা একটা সামাজিক মর্যাদার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আর এখন ইংরেজি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষা বলে তার গুরুত্ব ও প্রসার আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত, বিশ্বায়নের পর থেকে বিভিন্ন দেশে গিয়ে কাজের সুযোগ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংরেজি শেখার ঝোঁক অস্বাভাবিক দ্রুত হারে বেড়ে গেছে।

আমাদের সমাজে উচ্চবিত্তরা যা করে থাকে, সাধারণত তারই অনুকরণ বা অনুসরণ চলে মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত

পরিবারে। উচ্চবিত্ত পরিবারে ইংরেজিকে প্রথম ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার বিপুল চল তাই পরবর্তী সামাজিক শ্রেণিগুলিতে চারিয়ে গেছে বিগত কয়েক দশক জুড়ে। এই প্রবণতা নিন্দনীয় নয় নিশ্চিতভাবেই; কিন্তু তার জন্য মাতৃভাষাকে অপাংক্তেয় করা নিঃসন্দেহে সমালোচনার যোগ্য। মাতৃভাষার সঙ্গে তো আমাদের নাড়ির যোগ। তাই সেখানে আঘাত মানে তা যেন আমাদের শেকড়চ্যুত হওয়ারই শামিল। কেন্দ্রীয় বোর্ডগুলির গৃহীত ভাষানীতিও অত্যন্ত বিভ্রান্তিজনক। এইসব বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে যে কোনও একটি ভাষা নিলেই হয়। বলাই বাহুল্য সেই ভাষা হয় ইংরেজি। সম্ভবত কেন্দ্রীয় শিক্ষা পর্ষদ থেকেও ধরেই নেওয়া হয়েছে যে উচ্চ মাধ্যমিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবেও মাতৃভাষা পড়বার কোনও দরকার নেই। এই প্রবণতা ভীষণই বিপজ্জনক।

আসলে বিশ্বায়ন পরবর্তী এই ইঁদুর দৌড়ের কঠিন সময়ে আমাদের মধ্যে আবেগ ও অনুভূতিগুলি চলে যাচ্ছে পেছনের সারিতে। তার জায়গা নিচ্ছে প্রয়োজনের নিতান্তই পেশাদার দুনিয়া। যে বিষয়টি বা যে ভাষা আয়ত্ত করলে খুলে যাবে সাফল্যের শর্টকাট রাস্তা, সেইসবে পারদর্শী হয়ে ওঠাই আমাদের সাধনায় পরিণত হয়েছে। যেহেতু 'বাজার'-ই এখন মানুষের যাবতীয় চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে, তাই বাজারমুখী বস্তু বা বিষয়ের গুরুত্বই আকাশছোঁয়া। এই হিসেব কষে উন্নতির দিকে পদক্ষেপ ফেলা প্রজন্ম তাই মনের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে নেহাত কৈশোরেই জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হচ্ছে। দ্বিতীয় ভাষা, তা সে মাতৃভাষা হোক বা অন্য কোনও ভাষা, ততক্ষণই এই প্রজন্ম আয়ত্ব করবে, যতক্ষণ তার কোনও অর্থকরী ভূমিকা থাকবে। সেটুকুও যদি না থাকে, তাহলে দ্বিতীয় ভাষারও কোনও অস্তিত্ব হয়তো আর পরবর্তীতে থাকবে না।

একটি শিশুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার মায়ের ওপর। তার জন্ম থেকে শুরু করে বেড়ে ওঠা, বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শারীরিক, মানসিক এমনকি বিদ্যায়তনিক শিক্ষা সবই সে প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত হয় তার মায়ের কাছ থেকে। স্বভাবতই, ভাষাও তার ব্যতিক্রম নয়। সুতরাং, সেই মাতৃভাষাকেই যদি আমরা ক্রমশ উপেক্ষা করতে থাকি, তাহলে তা নিজের মা'কে উপেক্ষা করারই কি সমতুল্য নয়? মাতৃভাষার ডানায় ভর দিয়েই যে উড়াল দেওয়া সম্ভব, তা ভুলে গেলে যে কোনও গন্তব্যে পৌঁছানর আগেই বাস্তবের কঠিন ভূমিতে পতনের সম্ভাবনা কিন্তু থাকেই। বস্তুত, ঘরের সঙ্গে বাইরের কোনও বিরোধ নেই। কিন্তু ঘর-কেই যদি প্রবল বিরাগে অস্বীকার করে কেউ বাহিরকে সমূলে গ্রহণ করতে প্রত্যাশী হয়, তবে তা আদৌ কতটা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠতে পারে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

উন্নতির জন্য সবসময় ইংরেজি ভাষার মুখাপেক্ষী থাকতে হবে, এই ধারণা যে কতটা ভ্রান্ত ও অমূলক, তা কিন্তু প্রমাণ করে দিয়েছে এশিয়ার সবচেয়ে উন্নত দুটি দেশ চীন ও জাপান। এই দুটি দেশে ব্রিটিশরা কখনও কলোনি গড়তে পারেনি। সম্ভবত তার ফলেই চীন ও জাপানে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার প্রতি নির্ভরশীলতা গড়ে ওঠেনি। সবচেয়ে বড় কথা, উক্ত দুই দেশের জনগণই তাদের মাতৃভাষা এবং দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অসম্ভব শ্রদ্ধাশীল। তাই বিজ্ঞান থেকে শুরু কলাবিদ্যা, সর্বত্রই তারা নিজস্ব ভাষায় পরিভাষা সৃষ্টি করেছে এবং মাতৃভাষাতেই শিক্ষাদান ও শিক্ষালাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ইংরেজিই বরং সেখানে দ্বিতীয় ভাষা। শুধু অবশ্য ইংরেজি নয়; ফ্রেঞ্চ, জার্মান, রাশিয়ান, স্প্যানিশ প্রভৃতি প্রথম সারির প্রতিটি ভাষাকেই তারা নিজের নিজের চাহিদা অনুযায়ী দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। তবে মাতৃভাষাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েও অর্থনীতি, শিল্প, জীবনযাত্রা থেকে শুরু করে সুখের সূচক সবেতেই যে তারা গোটা বিশ্বের মধ্যে একদম প্রথম দিকে স্থান ধরে রেখেছে, এর থেকেই বোঝা যায় মাতৃভাষার গুরুত্ব। আর দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে কোনও বিদেশী ভাষা শেখাও যে বহুগুন কার্যকর হতে পারে, তাও এই দুই উন্নত দেশের সাফল্যের খতিয়ান থেকেই স্পষ্ট।

৪০৫.৪.১.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। দ্বিতীয় ভাষা বলতে কী বোঝায়? এই ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

২। দ্বিতীয় ভাষা ও প্রথম ভাষার ধারণা দিয়ে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা ভাষার প্রকৃত অবস্থার চিত্র অঙ্কন করো।

৪০৫.৪.১.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত, 'বহুরূপে ভাষা' (পঞ্চম খণ্ড), ২০১৯, প্রতিভাস, কলকাতা

২। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে' (২০১৩), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-২

‘পরকীয়া ভাষা’

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.৪.২.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.৪.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.৪.২.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.৪.২.১ : মুখবন্ধ

পরকীয়া প্রেম যেহেতু প্রকাশ্য নয়, তাই তার নিজস্ব ইঙ্গিত তৈরি হয় সময় আর সুযোগের ফাঁকফোকরে। মূলগত গোপনীয়তার কারণেই হয়তো পরকীয়ার কোনও আটপৌরে সংলাপ নেই। আছে সংকেত। পরকীয়া বোঝে যে প্রেমিক বা প্রেমিকাকে আড়ালেই রাখতে হয়। তাকে প্রকাশ্যে আনা মানে নিজের ও পরিবারের সামাজিক সম্মানহানি। আবার গোপনে রাখলে বিপরীতে থাকা মানুষটির যে অভিমান হয় তা সে বোঝে। কারণ প্রেম নিজের স্বীকৃতি চায়। ফলে নিতে হয় ভারসাম্যের পথ। কিন্তু ভারসাম্য থাকে না। যে কারণে পরকীয়া প্রেমের অধিকাংশ কথোপকথনই হয়তো আচমকা শেষ হয়ে যায়। মাঝপথে তাই অপ্রস্তুত মুখে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে তার যাবতীয় আদর, সোহাগের কথা। ফলে পরকীয়ার নিজস্ব কোনও ভাষা তৈরি হয়ে ওঠে না।

অবশ্য সবসময় যে মুখের কথাতেই বোঝাতে হবে, তাও তো নয়। সে জাহির করতে, জানান দিতে চায়। সবাইকে নয়, সে সাহস তার নেই। তবে পছন্দের মানুষটিকে অবশ্যই। সে প্রেম এগোয় চুপিসারে, গেরিলা যোদ্ধার মতো। সবার অলক্ষ্যে। নিখুঁত লক্ষ্যে ছুঁড়ে দিতে চায় সযত্নে রচিত পুষ্পশরটি। ভিড়ের মধ্যে একান্ত চাউনি, রাস্তায় অন্যমনস্কতার ভান করে যেতে যেতে আড়চোখে এক ঝলক দেখে নেওয়া খোলা জানালাটির দিকে, কাজের অছিলায় সন্তর্পণে ছুঁয়ে দেওয়া ভীরু আঙুল— এভাবেই ক্রমশ তৈরি হয় পরকীয়ার নিজস্ব পরিভাষা। তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের যতটা মিল, ততটাই অমিল।

পরকীয়া মানেই স্বাভাবিক সম্পর্কের জন্মশত্রু। দু-চক্ষের বিষ এক জারজ সে। কেউ তাকে চায়নি। তবু সে এসে গেছে দুই নারী-পুরুষের মাঝে। অবৈধ, সামাজিক অনুমোদনবিহীন। সে চিরকালই দ্বিতীয় পক্ষ, দুয়োরানি। স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে সর্বনাশা তৃতীয় মানুষটি। কাজেই সে কখনও পারে না সোচ্চার হতে। লোকসমক্ষে জানান দিতে পারে না নিজের অস্তিত্ব। নিরুচ্চারে তার কথা কখনও শুধু নিজের সঙ্গে, কখনও মেসেজ পাঠিয়ে উত্তরের আশায় বসে থাকা। সে এক অনন্ত অস্থিরতা। কতক্ষণে চারপাশের নজর এড়িয়ে, সব ব্যস্ততা সেরে দু-লাইন জবাব দেওয়ার সময় পাবে অন্য পারের লোকটি। কখনও কখনও অধৈর্য মিসড কল। একের পর এক। ডাক দিয়েই থেমে যাওয়া। স্রেফ এইটুকু জানিয়ে দিতে, কথা না বলতে পেরে বুক ফাটছে। উত্তরে কখনও মিসড কলই আসে। জানতে যে আমিও, আমিও একই রকম মিস করছি। আমিও চাইছি কথা বলতে। প্রতি মুহূর্তে মনে পড়ছে। কিন্তু উপায় নেই। কথা বলা যাবে না। কথা থেকেও নেই।

আর এই ভাষাহীনতার, এই বোবা সংলাপের উল্টো দিকটা, মুদ্রার অন্য পিঠটাও এই রকম নির্বাক। যখন পরকীয়া প্রকাশ হয়ে পড়ে কোনও অসর্তক মুহূর্তে বা দুর্ঘটনাবশত। প্রাথমিক দোষারোপ, পরস্পরের ভুল খোঁজাখুঁজি আর ঝগড়াঝাটির পরও আর কোনও কথা থাকে না। দুটো মানুষ যখন হঠাৎ আবিষ্কার করে, আগুনে অসর্তক হাত পুড়ে যাওয়ার মতো যে দাম্পত্যের মধ্যে তৃতীয় একজন এসে বাসা বেঁধেছে, তখন যাবতীয় বিনিময় যেন ফুরিয়ে যায়। তার পরেও হয়তো সম্পর্ক টিকে থাকে নানাবিধ কারণে। লোক লজ্জার ভয় কিংবা পারিবারিক চাপ অথবা হয়তো সন্তানদের মুখ চেয়ে। কিন্তু কেজো সাংসারিক কথাবার্তার বাইরে কোনও নিভৃত সংলাপ, কোনও অন্তরঙ্গ কথা আর উচ্চারণ খুঁজে পায় না তখন। পরকীয়ার তৃতীয় পক্ষটি তখন যদি বা আর নাও থাকে, তার অন্ধকার ছায়া পড়ে থাকে দুটো মানুষের ঠিক মাঝখানে এক ছাদের তলায়, এক কথায় সহবাসে অভ্যাসে দুটো মানুষ নির্বাক থেকে যায় পাশাপাশি বাকি জীবন। সেই স্তব্ধতার একটাই আধার থাকে। অবিশ্বাস। যেটুকু যন্ত্রণা, হতাশা আর অপ্রেম জড়িয়ে থাকে তার গায়ে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনুভূতিগুলোও আলগা হয়ে খসে পড়ে একে একে। পড়ে থাকে ওই অবিশ্বাসটুকুই। আর তারও কোনও ভাষা থাকে না। কারণ যা থেকে এর শুরু সেই পরকীয়ার তো আসলে নিজস্ব কোনও ভাষা নেই। রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় গল্পে দেখি, 'কাগজের আবরণ ভেদ করিয়া স্বামীকে অধিকার করা' চারুর কাছে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। অমল, একাকীত্ব এবং ঔদাসীন্যে স্থির চারুলতার মধ্যে প্রগাঢ় অনুভূতির বীজ বপন করে। এই কাহিনিকে নিয়ে সত্যজিৎ রায় তাঁর 'চারুলতা' সিনেমার একেবারে শেষ দৃশ্যে একটি ফ্রিজ শট ব্যবহার করেছিলেন। যেখানে স্পর্শ থেকে দূরে স্থির থাকা দুজনের দুটি হাত একটি অদৃশ্য দূরত্বকে স্পষ্ট করে তুলছে। সত্যজিৎ পরকীয়ার ব্যঞ্জনাকে এভাবেই ভাষা দিয়েছিলেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়মিত সম্পর্কের বাইরে পা বাড়ানোর প্ররোচনা দুটো মানুষের যে সম্পর্কহীনতা থেকে তাও ভাষাহীন। কথা চালু থাকলে তো শূন্যতা তৈরিই হতো না কখনও। পরকীয়ার সম্পর্ক তো আসলে সেই বোবা শূন্যতাকে ভরাট করতেই এগিয়ে আসে। হঠাৎ আবেগের বন্যায়, আত্মনিয়ন্ত্রণের দুর্বল বাঁধ ভেঙে ধেয়ে আসা কামনা-বাসনার নোনা জল। নিঃশব্দে ক্ষইয়ে দেয় স্মৃতি, সত্তা, ভবিষ্যত। একদিন আচমকা চৈতন্য হয় সেই আদরের ডাকনামেই একান্তে ডাকছি এখনকার প্রেমিককে, যে নামে আগের জনকে ডাকতাম। তাকে যা যা বলেছি, সেই একই কথা বলছি তাকেও। আসলে পরকীয়ার জন্য কোনও সঞ্চয় থাকে না আলাদা করে রাখা। যা থাকে সবই ব্যবহৃত। সেকেন্ড হ্যান্ড। এমনকি ভাষাও।

৪০৫.৪.২.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। ‘পরকীয়ার ভাষা’ অন্যান্য ভাষা থেকে কতটা আলাদা? এই ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে তা উদাহরণসহ আলোচনা করো।

২। পরকীয়ার ভাষা বলতে কী বোঝায়? উদাহরণসহ এই ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করো।

৪০৫.৪.২.২ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত, ‘বহুরূপে ভাষা’ (পঞ্চম খণ্ড), ২০১৯, প্রতিভাস, কলকাতা

২। ড. সুখেন বিশ্বাস, ‘প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা’ (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। ড. সুখেন বিশ্বাস, ‘প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা’ (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪। ড. সুখেন বিশ্বাস, ‘ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ’, ২০২২, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, ‘বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে’ (২০১৩), দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-৩

'ব্ল্যাকমেলের ভাষা'

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.৪.৩.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.৪.৩.২ : হসপিটাল নাকি নার্সিংহোম। ডেলিভারি কোথায় হবে?

৪০৫.৪.৩.৩ : সাইন্স নিতে হবে। আর্টস পড়ে কিছু হবে না

৪০৫.৪.৩.৪ : খবরদার কেউ যেন জানতে না পারে

৪০৫.৪.৩.৫ : সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্তরঙ্গতার ছবি ফাঁস

৪০৫.৪.৩.৬ : তুমি স্বেচ্ছায় রিলেশনে এসেছো। এখন ওসব চলবে না

৪০৫.৪.৩.৭ : আজই হাঁড়ি আলাদা করো। নইলে বাপের বাড়ি.....

৪০৫.৪.৩.৮ : দাদা ভোটটা একটু দেখে দেবেন

৪০৫.৪.৩.৯ : এবারের চাঁদাটা কিন্তু ধরে দিতে হবে

৪০৫.৪.৩.১০ : কেসটা তুলে নিন। মালদার লোক। আপনি লড়তে পারবেন না

৪০৫.৪.৩.১১ : জমি চাস না জীবন?ক্ষত।

৪০৫.৪.৩.১২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.৪.৩.১৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.৪.৩.১ : মুখবন্ধ

ব্ল্যাকমেল! ব্ল্যাকমেল! ব্ল্যাকমেল! দুধের ঝিনুক-বাটি হাতে মায়ের ব্ল্যাকমেল—"এ বাঘ আয় তো, মনাটাকে ধরে নিয়ে যা।" বাবার গম্ভীর গলায় ব্ল্যাকমেল—"ফের যদি না ঘুমিয়ে খেলতে যাও তো, মেরে ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব।" স্কুলে মাস্টারমশাই ব্ল্যাকমেল—"আজই তোমার বাবাকে বলব...।" ছেলেবেলায় বন্ধুর ব্ল্যাকমেল—"তুই যদি ওর সঙ্গে কথা বলিস তাহলে আমার সঙ্গে আড়ি।" কৈশোরে আসে নানান গোপনীয়তা। সেই গোপনীয়তাকে কেন্দ্র করে আসে অজস্র ব্ল্যাকমেল। দিদির ব্ল্যাকমেল—কোচিং -এ যাচ্ছিস ঠিক আছে, কোনো মেয়ের পাল্লায় পড়িস না। এখন কেরিয়ার গড়ার সময়।" মনে পড়ে যায় জয় গোস্বামীর কবিতার সেই লাইনটি—"**তোমাকে পেতেই হবে শতকরা অন্তত নব্বই (বা নব্বইয়ের বেশি)**" এরপর একের পর এক ব্ল্যাকমেল চলতে থাকে। বাবার ঘাম, হাড়ভাঙা ওভারটাইম, মায়ের মুখে রক্ত তোলা খাটুনি।

আসলে আমাদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে ভয়। লোকলজ্জার ভয়, না পাওয়ার ভয়, পেয়ে হারানোর ভয়, একাকিত্বের ভয়, অপমানের ভয়, আর্থিক ভয়, মৃত্যু ভয়। মান-হুশ সম্পন্ন মানুষের জীবন আর ভয় একই সরল রেখায় অবস্থান করে। আর এই ভয় থেকেই আসে ব্ল্যাকমেল। জীবনে চলার প্রতি পদক্ষেপে জড়িয়ে থাকে ব্ল্যাকমেল।

৪০৫.৪.৩.২ : হসপিটাল নাকি নার্সিংহোম। ডেলিভারি কোথায় হবে?

বিশ্বায়নের যুগে আমাদের জীবনে অনেক বেশি কমপ্লিকেশন। ব্ল্যাকমেলিংটাও স্বাভাবিকভাবেই অনেক বেশি। "কসাই জবাই করে প্রকাশ্য দিবালোকে, তোমার আছে ক্লিনিক আর চেম্বার।" নচিকেতার গানের লাইনটি মনে পড়ে যায় যখন হসপিটাল, নার্সিংহোম, চেম্বারে গিয়ে রোগীকে ব্ল্যাকমেলের শিকার হতে হয়। গর্ভবতী মাকে শুনতে হয় "হসপিটাল নাকি নার্সিংহোম। ডেলিভারি কোথায় হবে?" আবার কখনও কমপাউন্ডার প্রেস্ক্রিপশন হাতে নিয়েই—"ব্লাডটেস্টগুলো ওখান থেকেই করাবেন। না হলে ডাক্তারবাবু দেখবেন না। ওষুধগুলো এখান থেকেই নেবেন। সব পেয়ে যাবেন।" "একটু কমপ্লিকেশন আছে, সিজার করাই ভালো।" "ব্লাড নেই। বললে, অন্যভাবে ব্যবস্থা করা যাবে।"

৪০৫.৪.৩.৩ : সাইন্স নিতে হবে। আর্টস পড়ে কিছু হবে না।

সন্তান জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ঘিরে বাবা মায়ের একরাশ প্রত্যাশা। ওয়ান চাইল্ড বলে কথা। একজনকে ঘিরেই গড়ে ওঠে হাজারও স্বপ্ন। ভালো গাইতে হবে। নাচতে হবে। ভালো ছবি আঁকতে হবে। মার্শাল আর্ট শিখতে হবে। এন.আর.আই হতে হবে। সন্তান কী চায় সেটা ভাবি না। তাই মৌপ্রিয়ার মতো যারা কবিতা লিখতে, সাহিত্য পড়তে ভালোবাসে তাদেরও বাধ্য হয়েই নিতে হয় সাইন্স। শুনতে হয়, আর্টস নিয়ে পড়ার থেকে না পড়াই ভালো।

৪০৫.৪.৩.৪ : খবরদার কেউ যেন জানতে না পারে

মেয়ে মানেই দুশ্চিন্তার বোঝা। বাবার কপালে ভাঁজ। মায়ের চোখে সদা সর্বদা আতঙ্ক। পড়শির কুনজর। বন্ধুবান্ধবের মাঝে নানা দোলাচল। কেননা বহু মেয়েবেলাতেই মিশে থাকে অজানা অন্ধকার। কখনও গৃহশিক্ষক, কখনও মামাতো ভাই, পাড়ার দাদা, কাকু। সকলের এক কথা। কেউ যেন জানতে না পারে। এ তো গেলো পরের কথা। কিন্তু যখন নিজের পরিবার, নিজের মা লোকলজ্জার ভয়ে মেয়েকে শেখাতে থাকে, কাউকে বলতে নেই—এ গোপন যন্ত্রণা সে কোথায় রাখবে? কীটদ্রষ্ট পুঁথির মতো চলে যায় শিশু মনের অনুভূতির জৌলুস।

৪০৫.৪.৩.৫ : সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্তরঙ্গতার ছবি ফাঁস

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি সমগ্র বিশ্বকে যেমন মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে, পাশাপাশি এনে দিয়েছে নানান জটিলতা। মোবাইল নষ্ট করেছে প্রাইভেসি। ভালবাসার মানুষটাকে করেছে বিশ্বাসঘাতক। ব্ল্যাকমেলের হাতিয়ার মোবাইলের বিকল্প আর কি হতে পারে। ফেসবুক, হোয়াটস অ্যাপ, মেসেঞ্জারের মতো সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে প্রথমে বিশ্বাস অর্জন পরে বিশ্বাসভঙ্গ। ব্যক্তিগত ছবি, ভিডিও জনসমক্ষে তুলে ধরার হুমকি। এ যেন দৈনন্দিন ঘটনা। তাই প্রতিনিয়তই আমাদের চোখে পড়ে— ব্ল্যাকমেল করে লাগাতার ধর্ষন, সোশ্যাল মিডিয়ায় নগ্ন ছবি ফাঁস হওয়ায় আত্মঘাতী তরুণী।

৪০৫.৪.৩.৬ : তুমি স্বেচ্ছায় রিলেশনে এসেছো। এখন ওসব চলবে না।

প্রেম-ভালবাসা থাকবে অথচ ব্ল্যাকমেল থাকবে না তা তো হতেই পারে না।

—অরূপ তোমার কেমন বন্ধু? আমার সঙ্গে রিলেশন রাখতে চাইলে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা যাবে না।

এগুলো হামেশাই চলতে থাকে। যদি এক্সট্রা ম্যারেটাল আফ্যেয়ারস হয় তো ব্ল্যাকমেলিং আরও বেশি।

—তুমি স্বেচ্ছায় রিলেশনে এসেছ। এখন সময় দিতে পারব না বললে শুনব না।

—আমাদের রিলেশনটা কনসেনসুয়াল ছিল তুমি এভাবে বসের কাছে নালিশ করতে পার না।

—আমি তোমার নামে পুলিশে কমপ্লেন করব। আমার কাছে সব প্রুফ আছে।

৪০৫.৪.৩.৭ : আজই হাঁড়ি আলাদা করো। নইলে বাপের বাড়ি.....

একান্নবর্তী পরিবার এখন ভেঙে 'ছোট পরিবার, সুখী পরিবার।' সেই ছোট পরিবার আরও ক্ষুদ্র হতে শুরু করেছে। স্বামী-স্ত্রী আর অ্যালসেশিয়ানের পরিবারে বাবা-মা ক্রমশ বোঝা হয়ে যাচ্ছে। তাই সকালে উঠেই স্বামীকে শুনতে হয়— "আমি কিন্তু অনেকদিন ধরেই সহ্য করেছি। আর নয়। হয় হাঁড়ি আলাদা হবে নয় আজই মিঠিকে নিয়ে বাপের বাড়ি।"

৪০৫.৪.৩.৮ : দাদা ভোটটা একটু দেখে দেবেন

রাজনীতি মানেই ক্ষমতার আগ্রাসন। একের মাথাকে নত করে অন্যের মাথাচারা দিয়ে ওঠা। ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে জীবন জীবিকার সুবিধা পাইয়ে দিতে বছরের পর বছর চলতে থাকে 'ভোট উৎসব'। এই উৎসবের মূলসুরই ব্ল্যাকমেল। শাসক দল প্রতিনিয়ত ভয় দেখাতে থাকে দুর্বল গোষ্ঠীর উপর। তাবড় তাবড় নেতা থেকে শুরু করে এলাকার চুনোপুঁটিদের মূল লক্ষ্য থাকে ব্ল্যাকমেলিং।

—ঘর তো পেয়েছিস। ভোটটা ঠিক জায়গাতেই দিস।

—যদি প্রাণে বাঁচতে চাস তো টিকিটের আশা ছেড়ে দে।

৪০৫.৪.৩.৯ : এবারের চাঁদাটা কিন্তু ধরে দিতে হবে।

কিছুটা সঞ্চয় কিছুটা লোন নিয়েই বিনয়বাবু স্ত্রী-মেয়েকে নিয়ে নতুন বাড়িতে উঠলেন। পাশেই ক্লাব। চলতে থাকে নানারকম ব্ল্যাকমেল।

—কাকাবাবু গৃহপ্রবেশ করলেন একটু মিষ্টিমুখ করাবেন না।

—এবারের চাঁদাটা একটু ধরে দিতে হবে কাকু।

৪০৫.৪.৩.১০ : কেসটা তুলে নিন। মালদার লোক। আপনি লড়তে পারবেন না।

বিয়ের পর থেকেই একটার পর একটা দাবী করতো শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। মারধর চলত প্রায়শই। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, বাবার বাড়ি ফিরে আসার চেয়ে, হাতে তুলে নিয়েছিল অ্যাসিড। তারপর সাতদিনে সব শেষ। অসহায় বাবা থানায় গিয়ে কেস করলো বিচারের আশায়। দুদিন যেতে না যেতে তাকে বোঝানো হল—"কেসটা তুলে নিন। মালদার লোক আছে। আপনি লড়তে পারবেন না। মেয়ে তো চলেই গেছে। কী হবে টাকা পয়সা নষ্ট করে।"

৪০৫.৪.৩.১১ : জমি চাস না জীবন?

রাস্তার ধারের আট কাঠা জমিটি অনেকবারই প্রমোটারের নজরে আসলেও এড়িয়ে গেছেন সুরেশবাবু। অনেকরকম প্রলোভন তিনি উপেক্ষা করেছে। এবার স্বামী-স্ত্রীর চিন্তা অতল অন্ধকারে হাতড়াতে থাকে। চেয়ারম্যানের দুই সাগরেদ স্ত্রীর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে বলে গেছে, জমি চাস না জীবন?

পরিবেশ, পরিস্থিতি, পরিপ্রেক্ষিত, সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা সমস্ত কিছুই ভাষাকে প্রভাবিত করে। আর সেই কারণেই ব্ল্যাকমেলের ভাষার রূপও বদলে যায়। কোনও ব্ল্যাকমেলে মিশে থাকে আবেগ, স্নেহ মিশ্রিত ভয়। আবার কোনোটাতে মিশে থাকে প্রাণের হুমকি। ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল তো চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। তবে কিছু ব্ল্যাকমেল থাকে অনেকেরই কাঙ্ক্ষিত।

—প্লিজ রাজি হয়ে যাও। তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না। —এই ব্ল্যাকমেলের মধ্যে মিশে থাকে অনেক বেশি ভালবাসা।

৪০৫.৪.৩.১২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। জীবনে চলার প্রতি পদক্ষেপে জড়িয়ে থাকে ব্ল্যাকমেল। দৈনন্দিন জীবনে ব্ল্যাকমেলের ভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগগুলি উল্লেখ করো।

২। ব্ল্যাকমেলের ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৩। ব্ল্যাকমেলের ভাষার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নিরাপত্তাহীনতা বা ভয়। এই নিরিখে ব্ল্যাকমেলের ভাষা ও ভয়ের ভাষার প্রয়োগগত সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দেখাও।

৪০৫.৪.৩.১৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত, 'বহুরূপে ভাষা' (পঞ্চম খণ্ড), ২০১৯, প্রতিভাস, কলকাতা

২। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে' (২০১৩), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-৪

'বাংরেজি ভাষা'

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.৪.৪.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.৪.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.৪.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.৪.৪.১ : মুখবন্ধ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে বাংলা ভাষা ক্রমশ বাংরেজির দিকে মোড় নিচ্ছে। তবে এ আর নতুন কি? ভাষা পরিবর্তনশীল। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বদলে যায় তার রূপ। সেকারণেই চর্যাপদের ভাষা আর সাম্প্রতিক বাংলা ভাষার মধ্যে বিস্তর ফারাক। মানুষের জীবনযাত্রার মান যত বদলেছে মানুষের মুখের ভাষাও সেভাবেই বদলে গেছে। বাংলা ভাষায় বিদেশি শব্দের আনাগোনা নতুন কিছু নয়। আইন, আদালত, লুঙ্গি, রিক্সা, আলু, কপি এগুলি আর আমাদের কাছে বিদেশি শব্দ নয়। বাংলা ভাষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। তবে এগুলো বাংলা ভাষার ভাঁড়ারকে সমৃদ্ধই করেছে। বাঙলা ভাষার মূলকে প্রভাবিত করতে পারেনি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ইংরেজি ভাষার আগ্রাসন বাংলা ভাষাকে রাহুর মতো গ্রাস করছে। শিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত মানুষেরা নিজেদের স্মার্ট দেখানোর উদ্দেশ্যে বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে জগাখিচুড়ি রকমের একটা ভাষা বলার প্রবণতা তৈরি করে নিয়েছে। তাই এখন আর কেউই শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে পারে না।

কলকাতা ও তার পার্শবর্তী এলাকা কিংবা শহুরে জীবনযাত্রা একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখতে পাব

—আজও মেড আসেনি।

—রোজ রোজ সেম এক্সকিউজ।

—আর পারছি না। ফেডআপ হয়ে গেছি রে।

আমরা এখন কথায় কথায় ইংরেজি বলি। সরি, থাঙ্ক ইউ, ওয়েল কাম এগুলোর কথা তো বাদই দিলাম, এখন আর সম্পর্ক নয় রিলেশন, প্রেমিক-প্রেমিকা নয় বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেণ্ড। মানিয়ে নেওয়া নয় অ্যাডজাস্টমেন্ট, বিবাহবহির্ভুত সম্পর্ক নয় এক্সট্রা ম্যারেটাল আফেয়ারস। এখন আর পুজোর কেনাকাটা নয়, পুজোর শপিং। মার্কেটিং। তৈরি হয়েছে, বিগবাজার, স্মার্টবাজার, স্টাইলবাজার।

একটি বিয়ে বাড়ির কথাই বলা যাক— "তোকে একদম ওয়াও লাগছে। একদম লাইট মেকআপ করেছি। জামাই একদম ফার্স্টক্লাস। স্টার্টারস খুব ভালো ছিল।" বাঙালি খাবারই বা কম যায় কিসে। এখন আর আলু ভাজা নয় আলু চিপস ডিমের চপ নয় ডিমের ডেভিল। ফুলকফির রোস্ট। আসলে বিয়েটাই হয়ে গেছে ম্যারেজ। আজ আর সাধ হয় না। হয় বেবি শাওয়ার।

সকালে ঘুম থেকে উঠে গুডমর্নিং, মায়ের হাতের ব্রেক ফার্স্ট থেকে শুরু করে রাতের ডিনার, গুডনাইট পর্যন্ত আমাদের জীবনে বাংরেজির প্রবণতা। কাজের প্রেসার, প্রতিদিনের রুটিন, সবকিছুতেই অফেন্স, অনেক বেশি কমপ্লিকেশন, একটু হেল্প, ফ্রেন্ডশিপ করা, কোয়াপরেট করা, ডিপ্রেশনে চলে যাওয়া, ম্যানেজ করা, ডিপলি চিন্তা করা, কমন সেন্স না থাকা, দরজা লক, বিষয়টাকে ওপেন করা, নিজেকে স্মার্ট দেখানো, খুব হান্ডসাম, গানের রিহার্সাল, পরীক্ষার গার্ড, খুব কেয়ারিং এরকম অসংখ্য উদাহরণ একটু খেয়াল করলেই আমরা দেখতে পাই। কেবলমাত্র ইংরেজি শব্দই নয়, কখনও গোটা গোটা বাক্যও সাবলীলভাবেই ব্যবহার করছি কথার মধ্যে— "তুমি অনেক করেছো, now it is my turn. okay. As your wish. তুমি এভাবে কথা বলছ কেন? Are you mad?, তুমি আমাকে চোখ রাঙাচ্ছ, How dare you?" এখন আবার অ্যাডভান্স ইংলিশ। break a leg– Im over the moon এর সাধারণ তরজমা করলে কি যে হবে তা বলাই বাহুল্য।

শুধু মুখের ভাষাই নয়, লেখার ভাষাও মোড় নিয়েছে বাংরেজির দিকে। খবরের কাগজ, পত্রপত্রিকা, গল্প, উপন্যাস, কবিতাতেও এসেছে ইংরেজি শব্দ। "আনন্দলোক তারকাদের লাইফ, লাইক, ডিসলাইক।" "ফ্যাশানে অভিজাত বেনারসি। রোমান্টিক অন্দরসাজ (সানন্দা)"। খবরের কাগজের হেডলাইন— "নোট ফর ভোটে ছাড় নেই সাংসদ, বিধায়কদের/ বিধানসভায় বাম ওয়াকআউট।" অলোকরঞ্জন লিখেছেন— ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা হল সাঁইত্রিশ বছর পর/ যেন তাঁর ঝরে গেছে প্রোফাইল। শ্রীজাত লিখেছেন, অফিসের জানালা দিয়ে স্টিল।/ মেঘে ক্ষোভ। অবরোধ। আপ ডাউন পাখিরা। (কম্বিনেশিয়া)।

আসল কথা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। প্রযুক্তিই মানুষের জীবনযাত্রাকে আমূল বদলে দিয়েছে। বদলে গেছে মানুষের কথা। কম্পিউটার, টেলিভিশন, মোবাইল, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাব ফেলেছে মানুষের জীবনে। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, টুইট্যার আমাদের লেখার রীতিকে বদলে দিয়েছে। ব্যস্তময় জীবনে সংক্ষেপ করার প্রবণতা বাড়িয়েছে। তাই rest in peace হয়েছে RIP– lots of love হয়েছে LOL. বাংরেজির প্রচুর উদাহরণ চোখে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে। প্রোফাইলের নামগুলোতেই দেখা যায়, Lovely রিয়া, প্রিন্স আকাশ, রান্নাবান্না ও বিউটি টিপস, শাড়ি কালেকশন, শাড়ি হাউস, আর্ট কুটির, শিল্পালয় আর্ট।

এবারে আসা যাক, বিজ্ঞাপনের কথায়। বর্তমান যুগ বিজ্ঞাপনের যুগ। ঘরের বাইরে পা রাখলেই রাস্তায়, বাড়ির ছাদে, মোড়ে-মোড়ে দেখা যায় বিজ্ঞাপন। চোখ বন্ধ করলে ভেসে আসে বিজ্ঞাপন। আসলে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে শিল্পসাহিত্য, ব্যবসা বাণিজ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি সমস্ত কিছুই চলে গেছে বিজ্ঞাপনের দখলে। রেডিও, টেলিভিশন,

সংবাদপত্র, ফেসবুক, ট্যুইটার, ইন্টারনেট, ইউটিউব সব কিছুতেই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনের ভাষাও বাংরেজির দিকে মোড় নিয়েছে। "নবাব কিনলে আরাম ফ্রি/ সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম বোরলিন/ আমি তো নতুন কোলগেট স্ট্রং টিথ-ই কিনে থাকি। এটাই আমার কাটিং মেশিন/ জিলেট গার্ড, এখন পান সাতটা সেভ মাত্র দশ টাকায়।

টিভি সিরিয়াল, সিনেমাতেও আমরা বাংরেজি ভাষা দেখতে পাই। 'অন্যায় অবিচার' সিনেমায় উৎপল দত্তের বাংরেজি সংলাপগুলো বেশ মজাদার। "মাউথের উপর নো করলে হেয়ার করব না স্যার।/ আঙ্গরি হয়ে গেলি, তুই রাগলে না রোজ ফ্লাওয়ার মানে গোলাপ ফুলের মতো দেখায়।" বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমরা অনেক ভুল বলে ফেলি। একদম ডল পুতুলের মতো লাগছে, রোজ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করি, আমাদের তো লাভ ম্যারেজ করে বিয়ে হয়েছে, অ্যাজ এ টিচার হিসেবে ইত্যাদি ভুলগুলো এখন বঙ্গ জীবনের অঙ্গ।

তবে একথা স্বীকার করতেই হয়, প্রযুক্তির যুগে সবকিছুর তরজমা করতে যাওয়াটা হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া কিছুই না। জীবন যখন বিলেতি ও বিলেতি স্বাচ্ছন্দ্যে সজ্জিত তখন সবকিছুর তরজমা করাটা নিছক বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। এখন যদি কাউকে বলা হয়, তোর দ্বি-চক্র যানটা নিয়ে একটু বাজার যাব, তাহলে বিষয়টা একটু বাড়াবাড়িই হয়ে যায়। তবে একথাও ঠিক বিশ্বায়নের যুগে ইংরেজি প্রীতি যেভাবে বাড়ছে, তাতে হয় তো খুব তাড়াতাড়িই শুনতে হবে, "জানেন দাদা আমার ছেলের বাংলাটা ঠিক আসে না।" যেটা আসে সেটা ঠিক বাংলা নয়, বাংরেজি।

৪০৫.৪.৪.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে কীভাবে বাংলা ভাষা ক্রমশ বাংরেজি হয়ে উঠছে? এই ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করো।

২। বাংরেজি ভাষা বলতে কী বোঝ? বাংলায় ইংরেজি ভাষার প্রভাব কতটা পড়েছে তা উদাহরণসহ আলোচনা করো?

৩। বাংরেজি ভাষা কি বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করছে না ইংরেজির প্রভাবে বাংলা ভাষার মাধুর্য নষ্ট হচ্ছে? মতামত দাও।

৪০৫.৪.৪.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত, 'বহুরূপে ভাষা' (পঞ্চম খণ্ড), ২০১৯, প্রতিভাস, কলকাতা

২। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে' (২০১৩), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-৫

‘স্তাবকতার ভাষা’

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.৪.৫.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.৪.৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.৪.৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.৪.৫.১ : মুখবন্ধ

বাংলায় একটা মূল্যবান কথা প্রচলিত রয়েছে— প্রশংসা সবসময় আড়ালে করতে হয়, আর সমালোচনা করতে হয় সামনাসামনি। অথচ আমরা, বিশেষত বাঙালিরা ঠিক উল্টোটাই করে থাকি সাধারণত। আড়ালে কারও সম্পর্কে নিন্দা-পরচর্চা করতে আমরা অসম্ভব ভালোবাসি। পক্ষান্তরে, যার প্রশংসা করি, তার সামনেই বিগলিত হয়ে নিরন্তর স্তুতি করতে আমাদের বাধে না। বস্তুত, সেই প্রশংসায় তখন এসে মেশে উদ্দেশ্যমূলক কিছু প্ররোচনা। এবং, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা দেখা যায়, তা হল— এই সকল প্রশংসাসূচক কথা পর্যবসিত হয় স্তাবকতায়!

কী এই স্তাবকতা? এটি একটি বিশেষ্য পদ, যার অর্থ হল খোশামোদ করা। সহজ করে বললে, কথার মাধ্যমে কাউকে (মূলত ঊর্ধতন বা ক্ষমতাবান কাউকে) খুশি করা, যাতে করে পরবর্তীতে নিজের স্বার্থ বুঝে নেওয়া যায় বা সেই ব্যক্তির থেকে কোনও বাড়তি কিংবা অনৈতিক সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেওয়া যায়। যারা স্তাবকতা করে থাকে, তাদের স্তাবক বা উমেদার বা চাটুকার ইত্যাদি নানান অভিধায় ভূষিত করার চল রয়েছে বাংলা ভাষায়। এই স্তাবকতার কিছু নিজস্ব ভাষা বা লক্ষ রয়েছে যা এই নিবন্ধে আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব।

দেখা গেছে, যখন কারও কাছ থেকে আমাদের কোনও প্রত্যাশা থাকে, অথচ সেই প্রাপ্তি সম্পর্কে নিজের মনেই থাকে সংশয়; অথবা হয়তো আমরা সেটির আদৌ যোগ্য নই— জানা থাকে সেই সত্যও; তখনই যেনতেন-প্রকারেণ আমরা তা অর্জন করার জন্য চাটুকারিতার আশ্রয় নিয়ে থাকি। আমাদের সচেতন মন কিংবা, এমনকি অবচেতনেও সর্বক্ষণ মনে হতে থাকে যে, এই মানুষটিকে এই কথাটি বললে খুশি হবে এবং তাহলেই আমার কার্যসিদ্ধি হবে। ফলে, সম্ভাব্য, অসম্ভাব্য সমস্ত রকমের স্তুতি-বাক্য আমরা প্রকাশ্যে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে এবং সম্ভব হলে অন্যান্যদের সামনেও নির্দ্বিধায় বলে থাকি। যারা এমনটা করে, তারা ভেবেও দেখে না যে এই আচরণে সেই ব্যক্তিটি বিব্রত হচ্ছে না তো! বা অস্বস্তি বোধ করে বিরক্ত হচ্ছে কি? উমেদারদের ভাবনায় এইসব চিন্তা তখন স্থান পায় না। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মতো তার তখন একটাই আকাঙ্ক্ষা, প্রশংসাসূচক কথার জাল বুনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করা এবং নিজের কাজ হাসিল করা।

আগে রাজামহারাজারা তাদের রাজসভায় মাইনে দিয়ে স্তাবক রাখত। অনেক সময় তাদের বলা হতো ভাঁড় বা বিদূষক। যদিও 'বিদূষক' শব্দটি আলাদা মাত্রা পায় রবি ঠাকুরের লেখনীতে। সেখানে দেখা গেছিল, বিদূষক আর মিথ্যে বলতে বা রাজার মন যুগিয়ে কথা বলতে পারছে না বলে কাজে ইস্তফা দিচ্ছে। কিন্তু এ নেহাতই ব্যতিক্রম। বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেখা যায় এই শ্রেণির স্তাবকেরা সম্রাটের মনোরঞ্জনেই ব্যাপৃত। রাজার হ্যাঁ-তে হ্যাঁ আর না-তে না মেলানো যেন সভাসদদের প্রাথমিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। সেই হিসেবে দেখলে রাজ-ঘনিষ্ঠ প্রায় সকলেই ছিল এক-একজন স্তাবক। শাসকদের, অর্থাৎ এইসব রাজা, নবাব, জমিদারদের মোসাহেবি করে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করত একটা বিরাট বড় শ্রেণি। আবার ইংরেজরা যখন এ দেশে শাসক হয়ে এল, তখন তাদের স্তাবকতা করাও কিছু ক্ষমতাবান মানুষের অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। শুধুমাত্র কোনও খেতাবের জন্য বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য নির্লজ্জভাবে দেশের মানুষের অনিষ্ট করেও অনেকেই ব্রিটিশরাজের তোষণ ও স্তাবকতা করে গেছে দীর্ঘদিন।

বাংলা সাহিত্যে এই স্তাবকতার ভাষাটি তার যাবতীয় আর্থ-সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক লক্ষণসহ উঠে এসেছে বারংবার। উঠে এসেছে তীক্ষ্ণ ও নিপুণভাবে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'তৈল' নামে একটি অসাধারণ হাস্যরস সমৃদ্ধ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেখানে তিনি দেখান, কীভাবে তেল দিয়ে মানুষ কাজ হাসিল করতে পারে। তিনি লেখেন— "বাস্তবিকই তৈল সর্বশক্তিমান; যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য,তাহা কেবল একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।" একদম বাস্তব জগতের অভিজ্ঞতা-নিষ্ণাত তাঁর এই বর্ণনা। শুধু তাই না, কীভাবে তেল দিতে হয়, কোথায়, কী পরিমাণে দিলে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল সমস্ত কিছুই তিনি শ্লেষ ও ব্যঙ্গ সহযোগে বর্ণনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিদূষক' গল্পের কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সেটি ছিল ব্যতিক্রম। এবারে আসা যাক তাঁর লেখায় যথার্থ কিছু স্তাবকতার প্রসঙ্গে। 'কণিকা' কাব্যগ্রন্থের 'কুটুম্বিতাবিচার' কবিতাটি আমাদের সকলেরই পরিচিত— "কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে,/'ভাই ব'লে ডাক যদি দেব গল টিপে।'/হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা;/কেরোসিন বলি উঠে, 'এস মোর দাদা।'" ছোট থেকেই কবিতাটির এত 'ভাবসম্প্রসারণ' করা হয়েছে যে এই পরিসরে নতুন করে তা নিষ্প্রয়োজন। আবার তাঁরই 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় পাই— "বাবু যত বলে, পারিষদদলে বলে তার শতগুণ!" এই কবিতাটিও বহুল প্রচলিত, তাই নতুন করে প্রসঙ্গ উল্লেখ না

করলেও বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে 'পারিষদদল'-এর স্বর কেন সময়ে সময়ে 'বাবু'-কেও ছাপিয়ে যায়। যূথবদ্ধ স্তাবকতার এ এক নির্মম দৃষ্টান্ত।

কবিতার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গল্প উপন্যাসেও বিষয়টি চকিতে উঠে এসেছে। 'রাজটিকা' গল্পে দেখা যায় নবেন্দু দীর্ঘদিন ইংরেজদের মোসাহেবি করে গেছে 'রায়বাহাদুর' খেতাবের জন্য। তাদের পেছনে অকাতরে খরচ করেছে। পার্টি দিয়ে মদ্যপান করিয়েছে, বিরাট অংকের চাঁদা দিয়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠের ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। কিন্তু স্বদেশী পরিবারে বিয়ের পর মূলত শ্যালিকাদের প্রভাবে সে এইসব কাজ থেকে নিবৃত্ত হয় এবং ইংরেজের পরিবর্তে ঘটনাচক্রে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে থাকে। গোটা গল্পে নবেন্দুর কর্ম তথা সংলাপে কখনও ইংরেজ কখনও কংগ্রেসের প্রতি স্তাবকতার প্রকাশ ঘটেছে। 'গোরা' উপন্যাসে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে উঠে আসে। গোরার ভক্তেরা, অর্থাৎ অবিনাশের দল মূর্খের মতো গোরার প্রতি চাটুকারিতা প্রদর্শন করত। আবার গোরা একবার যখন স্টিমারে উঠতে যায়, তখন দেখে এক ইংরেজ এবং এক সাহেব সাজা দেশীয় যুবক, কুলি মজুরদের হেনস্থা দেখে আমোদ অনুভব করছে। ইংরেজ যুবক যতটা হাসছে, দেশীয় যুবক স্বভাবতই তাকে দেখানোর জন্য আরও বেশি হাসছিল। এও এক ধরনের পরোক্ষ চাটুকারিতা। সবসময় যে মুখে কোনও কথা বলে উপরমহলকে সন্তুষ্ট করা হয়, তা নয়। এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিও আসলে স্তাবকতারই পরিচায়ক।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'কুইন অ্যান' গল্পেও নির্মল হাস্যরসের সঙ্গে এক খেতাব-কামী জমিদার ননীগোপাল চক্রবর্তীর যুগপৎ তেল দেওয়া এবং তৈলসিক্ত হওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। ননীগোপাল অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট উডবার্ন সাহেব দেশে ফিরে যাওয়ার আগে তার পোষা কিছু কুকুর ও একটা ঘোড়া বিলি কিংবা বিক্রি করে যাবে। ঘোড়া বিক্রির অনেক চেষ্টা করেও যখন সম্ভব হচ্ছিল না তখন তার ননীগোপালের কথা মনে পড়ে। ননীগোপালকে সে-ই রায় বাহাদুর খেতাব দিয়েছিল। আর এই ধরনের মানুষকে বেশি অনুরোধ করতে হয় না, এরা প্রভুভক্ত হয় এবং ব্রিটিশদের জন্য কিছু করতে পারলে বর্তে যায়। ফলে প্রস্তাব দেওয়া মাত্র তা লুফে নেয় ননীগোপাল এবং প্রয়োজন না থাকলেও চড়া দামে ঘোড়াটি কিনে নেয়। এই প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হয়, সেখানে ননীগোপালের তরফ থেকে স্তাবকতার চূড়ান্ত ব্যবহার দেখা যায়।

মজার ব্যাপার হল, এই ননীগোপালের মতো মানুষেরাই আবার নিজেরাও সবসময় স্তাবক-পরিবৃত হয়ে থাকে। তাই গল্পের পরবর্তী অংশে যখন সেই ঘোড়ায় চেপে ফটো তোলার ঘটনা ঘটে, তখন সেই মোসাহেববৃন্দের তাকে তৈল-সিঞ্চনের বিষয়টি ততোধিক হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। সেখানে তার পারিষদবর্গ সদাসর্বদা তার মন যুগিয়ে তো চলেই, এমনকি সদ্যক্রীত ঘোড়ার সহিস আমির হোসেন যখন রায় বাহাদুরের কোনও কথার প্রতিবাদ করে সঠিক তথ্য দিতে যায়, তখন সেই পারিষদদের মধ্যেই কেউ না কেউ তাকে চোখ টিপে সতর্ক করে দেয়। বস্তুত, এই সমাজব্যবস্থায় এটিই ঘটে থাকে। সত্যি কথাটা মুখের ওপর বলতে পারার মতো মানুষ দুর্লভ আজকাল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অতি-বিখ্যাত 'টোপ' গল্পে এই স্তাবকতা বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা মাত্রা পায়। এখানে কথক নিজেই স্তাবকবৃন্দের অন্যতম। রামগঙ্গা এস্টেটের রাজাবাহাদুর এন আর চৌধুরীর জন্মদিনে কথক তার প্রশস্তি করে একটি ছড়া লেখে। সেটি পড়ে রাজা যারপরনাই খুশি হয় এবং কথককে প্রায়ই কারণে অকারণে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায় এবং দামি উপহারও দিয়ে বসে। যদিও তার এইসব প্রাপ্তিতে বন্ধুরা বাঁকা কথা বলে থাকে। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কথক তখন যা ভাবে, তা স্তাবকতার ভাষার সার্থক উদাহরণ—

"রাজাবাহাদুরকে আমি শ্রদ্ধা করি। আর গুণগ্রাহী লোককে শ্রদ্ধা করাই তো স্বাভাবিক। বন্ধুরা বলে, মোসাহেব। কিন্তু আমি জানি ওটা নিছক গায়ের জ্বালা, আমার সৌভাগ্যে ওদের ঈর্ষা। তা আমি পরোয়া করি না। নৌকা বাঁধতে হলে বড় গাছ দেখে বাঁধাই ভালো, অন্তত ছোটখাটো ঝড়ঝাপটার আঘাতে সম্পূর্ণ নিরাপদ।"

বাস্তবিকই, এই মানসিকতা শুধু এই গল্পের কথকের নয়। আত্মমর্যাদাহীন, শিরদাঁড়ার অভাবে ধুঁকতে থাকা যে কোনও ব্যক্তিরই এ যেন আঁতের কথা। নিরাপত্তার সন্ধানে এরাই যুগে যুগে, দলে দলে বড় গাছে নৌকা বেঁধে নিশ্চিন্ত থাকে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরই আরেক বহুপঠিত 'হাড়' গল্পেও কেরানির চাকরি পাওয়ার জন্য উমেদারি করতে দেখা যায় গল্প কথককে। আর উমেদারি করতে এসে যেটি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন, সেই স্তাবকতাও করতে হয় তাকে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্য রায়বাহাদুরের প্রতি প্রশংসা বর্ষণ না করেও পরিস্থিতি অনুযায়ী তার সব কথা, গালগল্প, উপদেশ মন দিয়ে শুনতে হয় কথককে। স্তাবকতার এও এক লক্ষণ। নীরবে প্রতিটি কথায় সায় দিয়ে যাওয়া। ভুল শুনেও প্রতিবাদ না করা। বা, মৃদু প্রতিবাদ জানালেও, চাকরি বা অন্য কিছুর প্রত্যাশা থাকলে কখনওই সেই স্বর উঁচুতে তুলতে পারে না অসহায় প্রার্থীরা।

তবে এইসব চাটুকারদের ভিড়ে ক্বচিৎ-কদাচিৎ সত্যি কথা জোর দিয়ে বলার মতো মানুষও পাওয়া যায়। আলোচ্য নিবন্ধ শেষ করব তেমনই এক সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত তুলে এনে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী 'উলঙ্গ রাজা' কবিতায় একটি শিশুর জন্য অধীরে অপেক্ষা করেছেন। যখন রাজাকে নগ্ন দেখেও সবাই নিজের নিজের বিচার বুদ্ধি বন্ধক রেখে, কিংবা ভয়ে, অথবা সংকীর্ণ কোনও স্বার্থে, রাজাকে তা বলতে পারে না; বরং 'শাবাশ শাবাশ' বলে উৎসাহ দেয়, সেইসব প্রবঞ্চক, ভীতু ও স্তাবকের ভিড়ে তিনি কামনা করেছেন সেই শিশুটিকে, যে সরল, স্পষ্টবক্তা ও নির্ভীক।একমাত্র সেই এসে চিৎকার করে বলতে পারে, 'রাজা, তোর কাপড় কোথায়?' স্তাবকতার ভাষার মাঝে এ যেন এক ঝলক টাটকা বাতাস!

৪০৫.৪.৫.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। 'স্তাবকতার ভাষা' অন্যান্য ভাষা থেকে কতটা আলাদা? বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ভাষার প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

২। স্তাবকতা বলতে কী বোঝ? সমাজে ও সাহিত্যে স্তাবকতার ভাষার রূপ ও রেখাটি নির্মাণ করো।

৩। স্তাবকতার ভাষার উপর একটি নিবন্ধ রচনা করো।

৪০৫.৪.৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত, 'বহুরূপে ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০১৫, প্রতিভাস, কলকাতা

২। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে' (২০১৩), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

পত্র : ডিএসই-৪০৫

বিশেষ পত্র : ভাষাতত্ত্ব

পর্যায় গ্রন্থ : ৪

একক-৬

'মিথ্যা ভাষা'

বিন্যাসক্রম :

৪০৫.৪.৬.১ : মুখবন্ধ

৪০৫.৪.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

৪০৫.৪.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

৪০৫.৪.৬.১ : মুখবন্ধ

"লোকে আমায় ভালোই বলে দিব্যি চলনসই
দোষের মধ্যে একটু নাকি মিথ্যে কথা কই"

কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতায় মিথ্যে কথার চমৎকার বর্ণনাটি আমাদের শৈশব-মননে গেঁথে দিয়েছিলেন। ইংরেজি 'মিথ' শব্দের সঙ্গে 'মিথ্যা' শব্দের একটা সাযুজ্য বা মিল আছে। লোকসমাজে প্রচলিত মিথগুলো অল্পবিস্তর মিথ্যা এবং কল্পিত কাহিনির উপরেই নির্মিত। এই মিথ্যা নির্মাণের পিছনে একটা সজ্ঞাত, সচেতন প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই মিথ্যার নির্মাণ আসলে একটি জাগতিক প্রক্রিয়া। যে নির্মাণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের গোপন অভিপ্রায়, আকাঙ্ক্ষা, বিদ্বেষ অথবা নিজেকে বাঁচানোর তাগিদ। আত্মরক্ষার বা আত্মপ্রচারের সুনিপুণ এবং তীব্র প্রয়াস। এই মিথ্যে কথার সুচতুর প্রয়োগ দেখতে পাই প্রাচীন মহাকাব্যে। দ্রোণকে হত্যা করার জন্য যুধিষ্ঠির মিথ্যা কথার আশ্রয় নিয়ে বলেছিলেন, অশ্বত্থামা ইতি গজ। যার জন্য অর্জুন কর্তৃক তিরস্কৃতও হয়েছিলেন তিনি। ভ্রষ্ট হয়েছিলেন স্বর্গ গমনের পথ থেকে। মিথ্যা এবং মিথ্যাচার উভয়ই ভয়ংকর। তবে তার চেয়েও ভয়ংকর অর্ধসত্য। সাময়িক প্রয়োজন বা স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে মিথ্যাচার করলেও তার পরিণাম বা কুফল একদিন ভোগ করতেই হয়। কেননা সত্যই সুন্দর। মানুষ এই সত্য-সুন্দরের পূজারী। রবীন্দ্রনাথের কথার সুর ধরে তাই বলতে হয়—"ভালো মন্দ যাহাই আসুক/সত্যেরে লও সহজে।"

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'মিথ্যা' শব্দটির অর্থে বলেছেন, অলীক, ভ্রমমূলক, অসত্যপ্রতীয়মান। মিথ্যা নিরর্থক, নিষ্ফল এবং অমূলক। তবে 'মিথ্যা' শব্দটির অনেক প্রচলিত ব্যবহার আছে। যেমন— ঢপ, গুল, ভাট, গ্যাঁজানো ইত্যাদি। পূর্ববঙ্গে আবার মিথ্যা অর্থে ভুয়ো শব্দের ব্যবহার দেখতে পাই। চলিত বাংলায় মিথ্যা শব্দের একটি রূপ মিছা। কোথাও বা মিথ্যা বোঝাতে বলা হয় জল মেশানো। আবার দিব্যি নিয়ে কথা বলার মধ্যেও মিথ্যেকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় আরও বেশি করে। যেমন—তোর দিব্যি আমি সিগারেট খাইনি। বিচারের আদালতে ঈশ্বরের নামে শপথ করে চলে ডাঁহা মিথ্যের আড়ম্বর। ছাত্রছাত্রীরা অজুহাতের পসরা সাজিয়ে মিথ্যে বলে। বাড়ি ফিরতে দেরি করলে তাদের এক্সট্রা ক্লাস থাকে। লেখকেরা বলেন, লেখাটা হয়ে গেছে আর একটুখানি বাকি। এই মিথ্যা বলার অভ্যাসকে অতিরঞ্জিত করে তুলেছে মোবাইল। মোবাইল হয়ে উঠেছে অজুহাতের অন্যতম অস্ত্র। কল্যাণীতে থাকা কোনও ব্যক্তি বলে উঠছেন, তিনি রয়েছেন কলকাতায়। মিথ্যে ধরা পড়লে তখন মোবাইলের ব্যাটারি চার্জ ফুরিয়ে আসছে।

মিথ্যে কথা, মিথ্যে ভাষা কত রকমের হতে পারে, তা এবার দেখা যাক। আমাদের আশেপাশে প্রাত্যহিক জীবনে মিথ্যেভাষা যেভাবে শুনতে পাই, সেদিক থেকে বিচার করলে মিথ্যেভাষাকে আপাতভাবে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

যে মিথ্যা মানুষ নিজেই নিজেকে বলে, তাকে বলা যায় 'ভুল বিশ্বাস' (ব্যাড ফেথ)। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে আমিই কল্যাণীর সেরা রসগোল্লা বানাই। আবার, এমন কিছু মিথ্যা আছে, যা খুব সহজেই অন্যের কাছে ধরা পড়ে। সেই ধরনের মিথ্যাকে বলা হয় 'নগ্ন মিথ্যা' (বেয়ার ফেসেড লাই)। এই নগ্ন মিথ্যার একটি উদাহরণ— আমি শচীনের সঙ্গে ক্রিকেট খেলেছি। মিথ্যা কোনও না কোনওভাবে মানুষের ক্ষতিসাধন করে। যে মিথ্যা কেবল অন্যের ক্ষতি সাধন করে, তাকে বলা হয় 'বড়ো মিথ্যা' (বিগ লাই)। যেমন— আমি নিজের চোখে দেখেছি, তুমি সেখানে ছিলে। এই সামান্য মিথ্যা কারও জীবনের চরম সর্বনাশ করে ফেলতে পারে। অন্যদিকে, প্রতারণার উদ্দেশ্যে যে মিথ্যে বলা হয়, তা 'প্রতারণামূলক মিথ্যা' (ব্লাফিং)। একটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে— তুমি দু'লাখ দিলে চাকরি তোমার পাকা— আমরা বুঝতে পারছি, এই মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাউকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারিত করা হচ্ছে।

'বাগাড়ম্বর', 'বাজে কথা' বা 'বৃথা বাক্য' (বুলশিট) আবার ঠিক মিথ্যে নয়, কিন্তু কোনও কথাকে নিছকই বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলা। যেমন— আমাদের পাড়ার গবুবাবুর জন্য পুরো রাজ্যের মানুষ পাগল। তবে 'খানসামা মিথ্যা' (বাটলার লাই) কথাটা বাংলায় একেবারে নতুন এবং তেমনভাবে এর চল নেই। 'প্রাসঙ্গিক মিথ্যা' (কন্টেক্সচুয়াল লাই) শ্লেষ বক্রোক্তি হিসেবে অনেক সময় এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—এক কিলো চালের ভাত একাই খেয়েছি। বাড়ির গিন্নিদের মুখে এই ধরনের মিথ্যে প্রায় শোনা যায়। শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো মিথ্যেভাষার একটি প্রকারভেদ হল—'কথা ঢাকা মিথ্যা' (কভার লাই)। বিশেষত নিজের বা অন্যের কোনও ভুল ঢাকার জন্যই এই মিথ্যার উপায় ব্যবহার করা হয়।

সে আমাকে মিথ্যা চুরির অপবাদ দিয়েছে। ওদের জাতটাই ওরকম। — ঠিক এইভাবে অন্যের জাত-ধর্ম-জাতি-রাষ্ট্র-সরকার বা দল সম্পর্কে যে মিথ্যা বলে ক্ষতি করা হয়, তা হল 'মানহানিকর মিথ্যা' (ডিফামেশন লাই)। কারণ কোনও দল বা জাতি বা রাষ্ট্র—যাইহোক না কেন, সমস্তটাই খারাপ হতে পারে না। তেমনভাবে আরেক ধরনের মিথ্যে আছে, যাকে বলা হয়— 'বিচ্যুত মিথ্যা' (ডিফ্লেক্টিং লাই)। এই মিথ্যার আশ্রয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে

মানুষ মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে যেতে চায়। 'অস্বীকারমূলক মিথ্যা' (ডিসমিসাল লাই)-র একটি উদাহরণ হল— না আমার মনে পড়ছে না, তোমার সাথে আমার আগে এখানে কখনও দেখা হয়েছিল বলে। 'সত্য কমিয়ে বলা'-ও আসলে একধরনের মিথ্যা। আর তা হয় একমাত্র ঈর্ষা বা বিদ্বেষ থেকে। যেমন— আমি জানি তুই অত নম্বর পাওয়ার যোগ্যই না, নিশ্চয়ই তুই টুকলি করেছিলিস।

কোনও বিষয়কে অতিমাত্রায় রঞ্জিত করে পরিবেশন করা 'অতিরঞ্জিত' মিথ্যা। যেমন—সাপটা পাঁচফুট হতেই পারে না; আমি দেখেছি, আমাদের পাড়ার রাস্তার থেকেও বড়ো হত। 'বানানো' মিথ্যা আবার কিছুটা নিজেকে জাহির করাই উদ্দেশেই বলা হয়। উদাহরণ দেওয়া যায় জানিস তো, রবীন্দ্রনাথ, আমার পিসির বড় ননদের দেওরের শালার দূর সম্পর্কের আপন দাদু ছিল। এই বানানো মিথ্যার একটি মজাদার রূপ হল 'গুল দেওয়া' বা 'অসত্য বর্ণনা'। যেমন—আম্বানি নিজের থেকে প্লেন পাঠিয়ে দিলেন বলে নেমন্তন্নে আর না করতে পারলাম না! মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা করার আরেকটি পিঠ হল 'জালিয়াতি'। যেমন— চাকরিটা তোমার পাক্কা, শুধু বেশি না, লাখ সাতেক দিলেই হবে।

'অর্ধসত্য' — সবচেয়ে বিপদজনক। খিদে পাওয়া সত্ত্বেও বলা যে, না তেমন খিদে পায়নি। এই অর্ধসত্য মানুষকে বেশি করে অবিশ্বাসের পাত্র হিসেবে গড়ে তোলে। অপরদিকে, যা না জেনে বলা হয়— তাকে বলা যায়, 'সৎ মিথ্যা'। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে— বিজ্ঞানগতভাবে কথাটি ভুল হলেও আমরা অনেকেই সত্যিটা জেনেও কথাটা বলি। 'রসিকতাপূর্ণ মিথ্যা' (জোক্স) শব্দটি বললেই আমাদের মোল্লা নাসিরুদ্দিনের সংলাপ মনে পড়ে— সত্য সেটাই যা আমি কখনও বলিনি। আমাদের স্বাভাবিক জীবনে কিছু মিথ্যে বলতেও হয়— যেমন, 'শিশুর কাছে বলা মিথ্যা'। মা খেতে অনিচ্ছুক শিশুকে খাওয়ানোর সময় বলে ওঠেন— ভাত না খেলে ছেলেধরা ধরে নিয়ে যাবে। 'ভুলে গিয়ে মিথ্যা' বলার একটি উদাহরণ— অফিসের একটি বিশেষ কাজে আটকে পড়েছিলাম। তাই তোমার জন্মদিনে উপস্থিত থাকতে পারিনি। দোকানদার বা ব্যবসায়ীরা প্রায়-ই টাকা বা দ্রব্য কিংবা দাঁড়িপাল্লা ছুঁয়ে বলেন, বিশ্বাস করেন, এক পয়সা লাভ রাখছি না— এই ধরনের মিথ্যা হল, বাণিজ্যিক মিথ্যা। আবার, যেটা বন্যা বা কোনওরকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে, দুর্যোগের সময় প্রশাসন খুব করে থাকে, সেটি হল কম করে বলা বা ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিসংখ্যান না দেওয়া।

'বিপথে চালিত করা'-র জন্যে যে মিথ্যা, তা খুব মারাত্মক। এই মিথ্যাই আবার 'মহৎ মিথ্যা'-ও হতে পারে। যেমন— কাজ করে যাও, ফলের আশা কোরো না। ভগবান সব দেখছেন। 'ভুলে যাওয়া থেকে মিথ্যা'-র একটি সহজ উদাহরণ— ইস কেন যে একবার মনে করালে না, জিনিসটা কেনার পর ভুলে ফেলে এলাম। 'প্যাথোলজিকাল লাই' বিষয়টা খুব মজাদার। এক ধরনের লোক আছে যারা মিথ্যা না বলে পারেন না। বিশেষত রাজনীতিতে যারা নেতৃত্ব দেন, তাদের মধ্যে এটা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তাঁরা প্রকাশ্যে চিৎকার করে বলে যান— সরকার সবসময় আপনার পাশে আছে। আপনারা ভোটটা আমাদেরই দিন।

অনেকসময়, 'আগাম সিদ্ধান্ত থেকে মিথ্যা' (প্রিজুরি লাই)-র রূপটিকে বিচার ব্যবস্থায় খুব দেখা যায়। ভুল সাজা ঘোষণার পর মামলা নতুন করে সাজানোর মধ্যে দিয়ে এই মিথ্যে প্রকট হয়ে ওঠে। 'ভদ্র মিথ্যা' ভদ্রজনদের মধ্যে চলে খুব। কেউ জানেন, তিনি আসতে পারবেন না, তবু মিথ্যে ভদ্রতা প্রকাশ করার খাতিরে কখনওই না বলবেন না। মিথ্যা অসুন্দর। তাই মিথ্যে কালো— অন্ধকার। কিন্তু এই মিথ্যায় আবার 'সাদা মিথ্যা' হয়ে ওঠে

যখন, অন্যের ক্ষতি না করে নিজেকে বাঁচিয়ে মিথ্যা বলা হয়। যেমন, কলেজ কামাই হলে শারীরিক অসুস্থতার বাহানা দেখানো। সবশেষে, 'লাই ডিটেকটর যন্ত্রের সামনে মিথ্যা'। এও এক আশ্চর্য মিথ্যা। সত্যের আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কবুল করেও তাকে পুনরায় না বলা। যেমন— সেই বিষয়টা নিয়ে বলে সবার সামনে মরি আর কি!

মিথ্যা ভাষা মিছে কথার কারবারি হলেও প্রয়োগের ভাষার এক চমৎকার উদাহরণ। তাই এই ভাষা সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের ক্ষণস্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি করলেও সৃষ্টিশীলতার খাতিরে চিরজীবন্ত।

৪০৫.৪.৬.২ : আদর্শ প্রশ্নাবলী

১। মিথ্যা ভাষা বলতে কী বোঝায়? মিথ্যা ভাষার প্রকারভেদগুলি আলোচনা করে উদাহরণসহ আলোচনা করো।

২। মিথ্যা ভাষা কী? এই ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করো।

৩। মিথের সঙ্গে মিথ্যা ভাষার কি কোনও যোগ আছে? অতীতে ও বর্তমানে মিথ্যা ভাষার রূপ কীভাবে বদলে গেছে সে সম্পর্কে তোমার অভিমত লেখো।

৪০৫.৪.৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত সম্পাদিত, 'বহুরূপে ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০১৬, প্রতিভাস, কলকাতা

২। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (প্রথম খণ্ড), ২০২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৩। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'প্রসঙ্গ : বাংলা ভাষা' (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪। ড. সুখেন বিশ্বাস, 'ভাষাবিজ্ঞান : তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ', ২০২২, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৫। শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, 'বাংলা ভাষা : রূপে প্রয়োগে' (২০১৩), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা